ভুমিকা

আমি আমার সমস্ত লেখার সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য আল্লহ তা'য়ালার নিকট আমার সাধ্য অনুযায়ী দায়বদ্ধ। এবং আমি সে সম্পর্কে অবগত আছি ইন শা আল্লহ। আমি এই লেখাকে হাদিস এমনকি সীরাহ স্ট্যান্ডার্ড বলিনা। বরং আমি প্রায় সকল মুহাদ্দিসের শর্ত অনুযায়ী যয়ীফ রাবি। বরং আমি বলবো আমার এই লেখা তাবারি স্ট্যান্ডার্ড।

আমি আমার সোর্স উল্লেখ করতে কখনই বাধ্য নই বা ছিলাম না। যেকোন অভিযোগের জবাবের ক্ষেত্রেও তাই, সেটা যত গুরুতরই হোক না কেন। কাজ করলে অভিযোগ থাকবেই। সবাইকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। তাই এগুলোর জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করিনা। *বিশেষ করে যেকোন অযৌক্তিক এবং অপ্রাসঙ্গিক কমেন্ট ডিলেট করবার অধিকার আমি সংরক্ষণ করি।* এটা আমার অহংকার নয় ইন শা আল্লহ। আসলে ফলো আপ তর্ক করবার কোন ফলাফল হয়না। এটা শুধুই সময় নষ্ট নয়তো একে অন্যের প্রতি বিষেদাগার করে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো বলছি।

আগেও বলেছি আমি কোন গ্রুপকে রিপ্রেজেন্ট করিনা। কোন গ্রুপের সমালোচনা করার মানে তাদেরকে গোমরাহ মনে করা নয়। আর কোন কাজের প্রশংসা করার মানেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া নয়। কাজ করলে ভুল থাকবেই এবং আমার ক্ষেত্রেও তাই।

আর ফেসবুক জনপ্রিয়তার মোহও আমার এই লেখার মোটিভ নয় ইন শা আল্লহ। কেননা এই জনপ্রিয়তা ঠুনকো গ্রুপভিত্তিক আসাবিয়াযুক্ত।

যাদের ভালো বলি, তারা আজ মাথায় তুলে নাচে। কাল তাদের একটু ভুল ধরলে প্রথমে ডিফেন্স পরে গালাগালি। ইসলামিক দলের সমর্থকের ভিতরে আওয়ামী-বিএনপির সমর্থকদের মত দলান্ধতা দেখলে খারাপ লাগে, তবে এখন সয়ে গেছে।

প্রত্যেক দলের সমর্থকদের কাছে একটা আবদার। আমি সাম্প্রতিক সময়ে Communication এর উপরে একটা কোর্স করেছি। সেখানে পাব্লিক কমিউনিকেশনের একটা মূলমন্ত্র ধরা হয় Acceptance (or accepting blame) এবং Empathy.

ব্লেইমকে উড়িয়ে দেওয়ার অর্থ আপনি আসলেই আপনার দলের প্রতি সিন্সিয়ার নন। এম্প্যাথি মানে আরেকজনের জায়গায় বসে পৃথিবীকে কল্পনা করা।

সব দলই চায় রিক্রুট বাড়াতে, পাবলিক এক্সেপ্টেন্স আর ম্যাস কমিউনিকেশন। এর জন্য যতদিন আপনার Communication Skills ফ্যানবয়ইজম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, ততদিন আপনি আমার প্রাণপ্রিয় দলের আত্মঘাতী রিক্রুট থেকে যাবেন। আপনার গালাগালি আপনার এবং আপনার দলের প্রতি সাধারণ অডিয়েন্সকে তেমন ধারণাই দেবে, যা আপনি তাদেরকে দিচ্ছেন।

ক্রমঃ ১

#তালেবানসন্ত্রাসী এই হ্যাশটাগে লিখতে বসলাম। হ্যাশট্যাগে ক্লিক করলে লেখা পাবেন।

এই সিরিজে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত সম্মানসূচক আপনি, তিনি বা এই ধরণের সর্বনাম বা সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ যেমন করেছিলেন গিয়েছিলেন ব্যবহার করা হবেনা। সে, করেছিল গিয়েছিল ব্যবহার করা হবে। এবং এখানে ইসলামিক টার্ম যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ বজায় রাখবার চেষ্টা করা হবে।

আমি আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে লিখবো। যদি কারও উপকার হয় আল'হামদুলিল্লাহ। আর যেকোন ভুল অথবা ক্ষতির দায়ভারের জন্য আল্লহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। - Salman Saeed

ক্রমঃ ২

ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে একা একা পড়ালেখা করতাম। তালেবানদের নাম অতীতে অনেকের কাছে শুনলেও তালেবানদের সম্পর্কে প্রথম কোনো একাডেমিক স্কলারের কাছ থেকে বক্তব্য শুনেছিলাম ২০১৪ সালে, যতদূর মনে পড়ে। ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটির কোর্সে ড.বিলাল ফিলিপস তালেবানদের মূর্তি ভাঙা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সমালোচনা করেন এই বলে যে, ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র চার বছরের মাথায় দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস দমন, কূটনৈতিক অগ্রগতির আগেই তালেবান লিডার মোল্লা ওমর মূর্তি ভাঙবার মাধ্যমে শত্রু বাড়িয়ে ফেলে এবং হিকমতহীনতার পরিচয় দেয়।

সম্ভবত উপত্যকার বাংলা নাম বামিয়ান। মধ্য আফগানিস্তানের হাজরাজাতের এই ব্যামিয়ান উপত্যকায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত গৌতম বুদ্ধের দুটো মূর্তি ছিল। মূর্তি দুটো প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য হিসেবে Unesco World Heritage Site এর মর্যাদা পায়। একটা মূর্তি প্রায় ২০ তলা উচ্চতার (১৭০+ ফুট) আরেকটি ১৩ তলার মত।

১৯৭১ এর ৯ মাসের যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে আগের পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রায় ৫-৭ বছর পর। অন্যদিকে ১৯৮১ সাল বা তারও আগে থেকে যুদ্ধ-চলমান এমন একটা দেশের ক্ষমতা পায় মোল্লা ওমর ১৯৯৬ সালে।

বারবার আফগান কূটনৈতিক যোগাযোগের চেষ্টা করেও যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা বা তার মিত্রপক্ষের কারও স্বীকৃতি আদায় করতে তালেবান ব্যর্থ হয়। এর কারণ ছিল মূলত এই আফগানিস্তানে আমেরিকার পছন্দের

প্লেয়ার আহমেদ শাহ মাসুদ তখনও তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসার অভাবে শিশুমৃত্যুর হার, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের মোকাবেলায় তালেবান তখন ব্যস্ত মাসুদের পাশাপাশি। জাতিসংঘের সাহায্য আসতে চাচ্ছে, কিন্তু স্বভাবতই শর্তসাপেক্ষে।

এতদভিন্ন, মোল্লা ওমর ও তালেবান ছিল ইসলামের কট্টরপন্থী দেওবন্দি মাসলাকের অনুসারী। তারা ভীত হয় কয়েকটা ব্যাপারেঃ

১। সাহায্যের সাথে আসা বিপুল বিদেশী নাগরিকের আনাগোনা ও গোয়েন্দা তথ্যের আদানপ্রদান (যেহেতু আমেরিকা বা মেজর ইউরোপীয় দেশ থেকে সরকার হিসেবে তালেবান স্বীকৃতি পায়নি এবং গৃহযুদ্ধের শেষ প্লেয়ার মাসুদ তখনো জীবিত)

২। নারী ও শিশুর জন্য আসা সাহায্যে পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে।

৩। অবশ্যই সাহায্য পাবার সাথে অন্যান্য কিছু শর্ত।

২০০১ সালের শুরুর দিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের দুই মূর্তিমান বুদ্ধের জন্য কিছু টাকাপয়সা স্যাংশন করা হয়। যেগুলো আফগান সরকারকে দেওয়া হবে এক্সক্লুসিভলি বুদ্ধের মেইনটেনেন্সের জন্য। জীবিত হাজার হাজার অর্ধমৃত আর দুর্ভিক্ষপীড়িত আদমসন্তান দেখা মোল্লা ওমর মূর্তির তেমন কোন মেইন্টেনেন্সের দরকার আছে বলে বুঝতে পারেনা। সে শুধু দেখেছিল যে এই মৃত বুদ্ধ দুইজন শুধু কিছুদিনের বৃষ্টির জন্য সামান্য স্যাঁতস্যাঁতে। মোল্লা ওমর মার্চ মাসে মূর্তি ভাঙার নির্দেশ দেয় ক্ষুব্ধ হয়ে। কেননা মূর্তির মেইন্টেনেন্সের টাকা আবার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ডাইনামাইটে উড়ে যাওয়া মূর্তির ব্যাপারে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের কট্টর ইসলামিক আইডিওলজির দোহাই দেয়। রেফারেন্স দেয় সম্ভবত এই বলে যে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (স) ও মক্কার কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় মূর্তি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাতে কাজ হয়না। দেশে বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। মুসলিম, অমুসলিম, আলেম, গাফেল, সৌদি, বৌদি সব তরফ থেকে।

ক্রমঃ ৩

প্রথম অপারেশন, গ্রুপ গঠন ও কীভাবে লাইমলাইটে এলো

১৯৯৪ সাল। রাশিয়া সমর্থিত সরকারের পতন হয়েছে এবং পেশোয়ার চুক্তির বাস্তবরুপে আহমাদ শাহ মাসুদ (লায়ন অব পাঞ্জেশির) ও বুরহানউদ্দিন রব্বানির সরকার ক্ষমতা দখল করেছে। সোভিয়েতের শেষ সোলজারও আফগান ছেড়ে পালিয়ে গেছে অনেক আগেই। এরা (বুরহান ও মাসুদ) ছিল রাশান যুদ্ধের বীর সেনাপতি। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার (আরেক সোভিয়েত যুদ্ধের বীর) এর বিদ্রোহ এবং যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে তখনও সেন্ট্রাল সরকার তথা মাসুদদের সেইভাবে কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা হয়নি। তাই রাশান যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্রধারী পাকিস্তানে ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রুপ নিজেদের এলাকাভিত্তিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

আইনের শাসন নেই, সরকারী কন্ট্রোল নেই, এক দশকের বেশি ধরে চলা সোভিয়েত যুদ্ধের পরে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ যেখানে কষ্ট, সেখানে অস্ত্রধারী তথাকথিত 'মুজাহিদিন' গ্রুপের লুটপাট আর নৈরাজ্য আফগানিস্তানের সারা শরীর জুড়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

অনেকে মনে করেন তালেবান রাশিয়ান কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করে আফগান স্বাধীন করে। এটা ভুল।

১৯৯৪ সালের আগে তালেবান নামের কোন গ্রুপের অস্তিত্ব ছিলনা। তবে এটা ঠিক তালেবানদের সবাই না হলেও প্রথম অপারেশনের প্রায় সবাই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আফগানের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যেমন, মোল্লা ওমর মূলত আর্টিলারি চালিয়ে সোভিয়েত ট্যাংক ধ্বংস করত। এবং তালেবান ফর্মেশনের আগে আফগান কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে মোল্লা ওমর একজন নোবডির বেশি কিছু ছিলনা।।

সম্ভবত কান্দাহার প্রদেশের ঘটনা। কোন এক এলাকাভিত্তিক অস্ত্রধারী গ্রুপ এক গ্রামে লুটপাট চালায়। লুটের শেষে তারা দুটো মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় নিজেদের ক্যাম্পে উপর্যুপরি ধর্ষণের জন্য। সোভিয়েত যুদ্ধে এক চোখ হারানো মোল্লা ওমর তখন মাদ্রাসার শিক্ষক। ওমর তারই মতো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনার ট্রেনিং পাওয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক বেছে নেয়। ২৫-৪৫ জনের একটা গ্রুপ যারা মূলত নিজেদের তলিবে ইলম তথা জ্ঞানের ছাত্র বলে পরিচয় দেয়, তারা তাদের পুরনো অস্ত্রে পুনরায় শান দেয়। মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে সেই লুটেরা গ্রুপের ক্যাম্পে হামলা হয়। মেয়ে দুটো গ্রামে ফিরে আসে। মোল্লা ওমর ও এই তলিবান (students of knowledge)দের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধবিদ্ধস্ত এক জাতির সাধারণ মানুষ এই গ্রুপকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখে।

পরবর্তীতে উসামা বিন লাদেন এবং পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের থেকে প্রচুর সাহায্য পেলেও তালেবানদের গঠনের মূল ইতিহাস হল এই যে, তারা জনগণের সমর্থনে অনেক দূর যেতে সক্ষম হয়। আমার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পরবর্তী পর্বে আমি কিছু যুক্তি পেশ করবো। কেননা পাকিস্তানের আইএসাই এর তৈরি বা সিয়াইএ এর তৈরি বলে তালেবানদের ব্যাপারে দাবি করা হয়।

আফগানিস্তানের সোভিয়েত কিংবা সোভিয়েত উত্তর পর্বের এক কয়েকটা কী ফিগারের মধ্যে অবশ্যই সৌদি সালাফিজম, ওসামা বিন লাদেন, শাহ জিয়া থেকে নওয়াজ-পারভেজের পাকিস্তান ও উপমহাদেশের দেওবন্দিজমও আসবে ইন শা আল্লহ। আজ এ পর্যন্তই থাক। শেষ করবো তালেবানদের স্বচেষ্টায় লাইমলাইটে আসা দিয়ে।

১৯৯২ সালে সোভিয়েত সমর্থিত নাজিবুল্লাহ সরকারের পতন হবার পর, বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে পেশোয়ারে একত্রিত করা হয়। আসলে নাজিবুল্লার পতনের আগেই তখন কাবুল দখল শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল। আমেরিকা এবং পাকিস্তান উভয়েই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এক হয়ে যুদ্ধ করলেও তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট শাহ জিয়াউলের নীতি অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই পাকিস্তান, আমেরিকা ও আফগান গ্রুপগুলোর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিল। তাই সোভিয়েত চলে যাবার পর পাকিস্তানের পেশোয়ারে গ্রুপ লিডাররা একত্রিত হয়। ওসামা বিন লাদেন (যে এই যুদ্ধে বিপুল ফান্ডিং ও বিদেশী যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করেছিল) এই সম্মেলনকে সমর্থন করে। তবে 'মুজাহিদিন' গ্রুপগুলোর মধ্যে বড় একজন লিডার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। পেশোয়ার সম্মেলনের পর গুলবুদ্দিনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখেই বুরহানউদ্দিন রব্বানি ও মাসুদ সরকার গঠন করে। নানা ঘাত প্রতিঘাত পার হয়ে মাসুদ ও বুরহানের সরকার কাবুল দখল করলেও সমস্যা বাঁধে অন্যখানে। তা হল দুটোঃ

১। যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ গঠনের আগেই মাসুদ সরকারকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এর ফলে রাজধানী থেকে দূরে তেমন কোন কন্ট্রোল কেন্দ্রের হাতে ছিলনা। ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত যুদ্ধের অস্ত্রধারী গ্রুপগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে দেশের আগে থেকেই ভঙ্গুর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে একবারেই ভেঙে ফেলে। গ্রুপগুলোর লুটপাট, খুন, ধর্ষন ও রাহাজানি সাধারণ আফগানদের মাসুদ সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে।

২। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সৌদি আরব ধর্মযুদ্ধ হিসেবে অফিশিয়াল ফতোয়া দেয়। দেওবন্দিরা ইন্দো-পাক-বাংলাদেশ থেকে লোক পাঠায় ধর্মযুদ্ধের নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে। তাই এই যুদ্ধের শেষে কেন্দ্রে দেওবন্দি কিংবা সালাফি কট্টর ইসলামপন্থি সরকার গঠিত হবে এমনটাই ছিল বহু আফগানি উলামা ও আম মানুষের চাওয়া। কিন্তু আমেরিকা মূলত এই যুদ্ধে সমর্থন করে সোভিয়েতকে মার খাইয়ে নিজে শক্তির স্বাদ নিতে।

মজার ব্যাপার হল আমেরিকা যতদিন পক্ষে ছিল, ততদিন সবকিছু ধর্মযুদ্ধ তথা জিহাদ ছিল। সোভিয়েত যতদিন ছিল ততদিন প্রথম প্রায়োরিটি ছিল রাশিয়া হটাও কিন্তু সোভিয়েত যাবার পর পাকিস্তান, সৌদি, এবং আমেরিকার আলাদা আলাদা স্বার্থ আবিষ্কৃত হয়।

আহমাদ শাহ মাসুদ আমেরিকার একনিষ্ঠ সমর্থন আদায় করে যা তালেবানদের উত্থানের সময় আরও পাকাপোক্ত হয়। মাসুদ ও বুরহানউদ্দিন মূলত কট্টরপন্থী ইসলামী সরকার গঠনের বদলে একধরণের জগাখিচুড়ি আইডিওলজির 'না ঘারকা না ঘাটকা' টাইপ সরকার তৈরি করে যা ওয়াহাবি এবং দেওবন্দি উভয় ঘরানায় প্রত্যাখ্যাত হয়।

পাকিস্তান মাসুদকে দিয়ে স্বার্থ আদায়ে ব্যর্থ হয় কারণ মাসুদ ছিল আমেরিকার একান্ত অনুগত এবং মাসুদকে এই অনুগত হতে বাধ্য করেছিল চারিদিকের ক্রমহ্রাসমান মিত্রসংখ্যা। পাকিস্তান মাসুদের বিকল্প খুঁজতে থাকে।

সৌদি-আরব বিশেষ করে তাদের ওয়াহাবি উলামা মাসুদকে নিয়ে খুশি হবার কথা ছিলনা। কিন্তু আমেরিকা জুজুর ভয় দেখিয়ে সৌদিকে এই অঞ্চলে আর নাক না গলানোর নির্দেশ দেয়। সৌদি নাগরিক উসামা বিন লাদেন ও তার সহচর আদর্শগুরু আব্দুল্লাহ আযযাম ততদিনে আফগান ও হিন্দে জিহাদি জোশ ছড়িয়েছে এবং আফগানিস্তানে নেই ঈশ্বরবাদি কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামি খিলাফতের স্বপ্ন দেখিয়েছে। স্বভাবতই উসামা সরকার গঠনের পর মাসুদের কর্মকাণ্ডে নাখোশ ছিল। পরবর্তীতে ওসামা, সৌদি সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে, আফগান রাজনীতিতে নাক গলাতে আসলে সৌদিরাজ অনুগত উলামা তাকে ফতোয়াবানে জর্জরিত করে এবং আজও 'খারেজি' ও ইসলামি শাসকের বিদ্রোহি পাপী হিসেবে চিহ্নিত করে।

ঠিক এই অবস্থায় তালেবানের জনকল্যাণমুখী অপারেশনগুলো শুরু হয়েছিল। তালেবান একটা নির্দিষ্ট সীমানায় জনপ্রিয়তা ও টেরিটরি দখলে আনে। তারপর উসামা বিন লাদেন ও তার দল আল-কায়েদার সমর্থন ও পাকিস্তানের শক্তিশালী 'মাসুদ বিকল্প' হবার সুযোগ লাভ করে।

আফগান রাজনীতিতে মোল্লা ওমর হয়ে ওঠে এক নতুন কারিশমার নাম, যা পাঞ্জেশিরের সিংহ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ত্রাস, আহমেদ শাহ মাসুদকেও হার মানিয়ে দেয়।

ক্রমঃ ৪

বিংশ শতাব্দীর শুরুর পরাশক্তিগুলো দুটি বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কী প্লেয়ার হিসেবে। ব্রিটেন বা ফ্রান্স তাদের ইকোনমিকে অনেকটা স্যাক্রিফাইস করেই এ যুদ্ধগুলো জয়ের আকাঙ্ক্ষায় মেতে ওঠে। পক্ষান্তরে আমেরিকা প্রথম যুদ্ধে কী প্লেয়ার ছিলনা। রাশানরা ১৯১৭ এর পর নেই আর আমেরিকা পরে জয়েন করে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের ট্রেডিং এর পর, অস্ত্র ব্যাবসায়ীরা আমেরিকার সাধারণ জনগণের ভিতরে একটা ধারণা পুশ করে 'War is good for the economy'।

২য় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ও আমেরিকা দেরিতে ডিসাইসিভ এন্ট্রি নেয় এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আধিপত্য কমে যায় এবং পৃথিবীতে দ্বিমেরু রাজনীতির সৃষ্টি হয়। এই দুই মেরু ছিল উদ্ভূত দুই পরাশক্তি। ওয়াশিংটন ডিসি ও মস্কো। মজার ব্যাপার হল, একই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রাশিয়া ও আমেরিকা ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর একে অপরের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়।

আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল সেক্যুলার ডেমোক্রেসি আর রাশিয়ার ছিল কমিউনিজমের বিভিন্ন রাশান ভার্সন। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক রাজনীতিতে নাক গলাতে থাকে। এবং স্থানীয় সরকারগুলোও এই দ্বিমেরুর যেকোন একটা বেছে নেয় সুবিধামত। এর কারণগুলো ছিল সুপারপাওয়ারের জুজুর ভয়, আন্তর্জাতিক লবিং সুবিধা, বিপদের মুহূর্তে ইন্টেলিজেন্স ও অস্ত্র কিনতে পারবার ভরসা। দ্বিমেরুর এই পৃথিবীতে আমেরিকা মূলত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপকে পাশে পায়। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় ওয়াশিংটন বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়।

ইন্ডিয়া রাশান ব্লকে যায়। মুসলমান নামধারী রাষ্ট্রগুলোর জন্যে চয়েজ এক্টাই ছিল, সেটা হল আমেরিকা।

মুসলিম নামধারী সরকারগুলোর জন্য কমিউনিস্ট ব্লকে ঢোকার প্রধান বাঁধা ছিল ধর্ম। কারণ, কমিউনিজম নেই ঈশ্বরবাদের (নাস্তিকতার) প্রকাশ্য স্লোগান দেয়। অপরদিকে আমেরিকার সেক্যুলারিজম কুফর হলেও তা একটু ঘুরানো কুফর। অশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠী আজও সংবিধানকে সর্বোচ্চ আইন মানাকে কুফরি মনে করেনা। আর তাই পাকিস্তান, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশই রাশান ব্লকে যায়নি।

অবশ্য বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই দুইদিক বজায় রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর অনেক সরকারই এমন আচরণে বাধ্য হয়। তবে এই কোল্ড ওয়ার বা দ্বিমেরুর পৃথিবীতে ৪৪ বছরের ইতিহাসে নানা উত্থানপতন আছে যা আমাদের পরিসরের বাইরে।

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও রাশিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে পরোক্ষ যুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ারে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ ছিল প্রভাব বিস্তারের যুদ্ধ। বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের পছন্দের সরকার তৈরি করা, প্রাকৃতিক সম্পদে নজরদারি করা, মনোপলি ইকোনোমিক সিস্টেম তৈরি করা (যা আজও আফ্রিকা জিইয়ে রেখেছে) ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন খুন, হাইজ্যাক, ইন্টেলিজেন্স পার্সোনেল হত্যা সবই চলত।।

আফগানিস্তান হলো একদিকে ভারত উপমহাদেশের প্রবেশ পথ, অন্যদিকে সোভিয়েতের বর্ডারের কাছে। তাঁর উপর মুসলিম শক্তি পাকিস্তান ও ইরানের সাথেও এর বর্ডার থাকায় কোল্ড ওয়ারেও এর গুরুত্ব ছিল অনেক। যুগে যুগে অন্য পরাশক্তির কাছে অপরাজেয় আফগানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে দুই এই পরাশক্তির ভেতরে কোন্দল ছিল।

লম্বা গল্প অল্প কথায় বলতে গেলে, ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে রাজার শাসন চলত। রাজা জহির শাহের আমলে সোভিয়েত ও আমেরিকা উভয়ের সংগেই সুসম্পর্ক বজায় রাখে আফগানিস্তান। ১৯৭৩ সালে রাজা জহির শাহের পতন হয়। সম্ভবত ১৯৭৩-৭৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা দাউদ কিছুটা আমেরিকান ব্লকের সমর্থিত ছিল।

এরপর ১৯৭৮ সাল থেকে ৯২-৩ সালে আহমেদ শাহ মাসুদের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত বিভিন্ন সোভিয়েত সমর্থিত বা সোভিয়েত পুতুল সরকার ক্ষমতায় ছিল। এদের লিডারশীপ বদল হয়েছে তারাকি, বাবরাক কার্মাল ও সর্বশেষ নাজিবুল্লার হাতে।

১৯৭৮ সালে তারাকি ক্ষমতায় আসবার পর থেকেই বিভিন্ন ইসলামিক গ্রুপ বিদ্রোহ শুরু করে কমিউনিজম-গণতন্ত্র আর বাইরে ইসলামের লেবাসধারী সোভিয়েত সমর্থিত খিচুড়ি সরকারের বিরুদ্ধে। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধ পরবর্তীতে একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাগরণ পর্যন্ত ভূমিকা রাখে। এই গৃহযুদ্ধ কোল্ড ওয়ারে সোভিয়েতের পরাজয়কে কেবল সময়ের ব্যাপার করে দেয়। এই গৃহযুদ্ধের বদৌলতে মুসলমানেরা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েতকে আফগান থেকে বিতাড়িত করে বিংশ শতাব্দীর ইলুশনারি কমিউনিজমকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়। এই যুদ্ধের ফলাফল বহুকাল ধরে মুসলমান সভ্যতাকে প্রেরণা যুগিয়ে যাবে, নিরন্তর আশার আলো দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে সন্নিকট সূর্যোদয়ের দিকে।

ক্রমঃ ৫

সোভিয়েত আগমন এবং এর বিরুদ্ধে কোয়ালিশন, কাবায় হামলা, আব্দুল্লাহ আযযাম, ওসামা বিন লাদেন, সৌদি আরব, পাকিস্তান আমেরিকা ইত্যাদি

মূলত আমাদের বাংলার কমিউনিস্টদের মতই আফগান কমিউনিস্ট লিডারশীপ ছিল বহুধা বিভক্ত। এই বিভক্তি তাদের পতন ত্বরান্বিত করে এবং সোভিয়েতকে দুর্বল করে দেয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে সামাল দিতে গিয়ে কমিউনিস্টরা তাদের মূল শত্রু ইসলামিস্ট এবং আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়।

১৯৬৫ সালে কার্ল মার্ক্সের আদর্শে বিশ্বাসী কতক কমিউনিস্ট নেতা People's Democratic Party of Afghanistan গঠন করে। এই পার্টির মূল চারজন নেতার নাম উল্লেখ করব যারা পরবর্তীতে আফগানিস্তানের শাসনভার পাবে। এই সময় আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র ছিল। গঠিত হবার মোটামুটি ৩-৪ বছরের মধ্যেই কমিউনিস্টরা তাদের স্বভাবগত ভাবে আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে; খালক ও পর্চম।

খালক দলের প্রধান নূর মোহাম্মাদ তারাকি বিশ্বাস করত আকষ্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারাকির আদর্শ মূলত আফগান গ্রামগুলোতে জনপ্রিয় ছিল। তারাকির প্রধান সাপোর্টার ছিল হাফিজুল্লাহ আমীন। আইরনি হল আমীন তারাকিকে হত্যা করে ১৯৭৯ সালে ক্ষমতা দখল করে।

অপর গ্রুপের নাম ছিল পর্চম। নেতা বাবরাক কার্মাল মূলত Gradual Revolution এ বিশ্বাসী ছিল। তার ধারণা ছিল আপাতত ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী আফগান জনগণকে কমিউনিজমের বিষ খাওয়াতে হবে আস্তে-ধীরে। নাহলে রিএকশনে খোদ কমিউনিজমই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে শহুরে জনপ্রিয়তার অধিকারি কার্মালের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল। কার্মালের আদর্শে বিশ্বাসী ড. নাজিবুল্লাহ। সেও কার্মালকে অভিশংসন করে কালের পরিক্রমায়।

দাউদ খানকে সরিয়ে প্রথম আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করে খালক গ্রুপের নূর মোহাম্মাদ তারাকি (১৯৭৮ সালে)। তারাকি কঠোর হস্তে সমস্ত রাইভাল গ্রুপকে দমন করে। এক্ষেত্রে তার সহকারী হিসেবে সে পায় হাফিযুল্লাহ আমীনকে। PDPA বা People's Democratic Party of Afghanistan এর খালক ফ্র্যাকশন, যা মূলত কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করে প্রো-ইসলামিক আফগানিস্তানকে

রাতারাতি নাস্তিক কমিউনিস্ট স্টেটে বানাতে চেয়েছিল, তারা ক্ষমতায় থাকে মাত্র ২ বছরের মত। কিন্তু এই দুই বছর আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার কারণ হয়ে যায়।

তারাকি ও তার সহচর আমীন আফগানিস্তানে all-out দমন-পীড়ন চালায়। এই দুইয়ের হাত থেকে রেহাই পায়না দাউদ খানের সাপোর্টার ও গ্রাম্য প্রভাবশালী মৌলভির দল যারা কমিউনিজমকে ইসলামের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। এমনকি তারাকি-আমীন গ্রুপ PDPA এর আরেক ফ্র্যাকশন পর্চমের বাবরাক কার্মাল ও তার অনুসারীদের হত্যা ও বন্দি করবার পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে থাকে।

১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে তথাকথিত ইসলামিক রেভলুশন ঘটে। খোমেনি ইরানের শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। শাহ ছিল আমেরিকার একনিষ্ঠ ভালবাসার মানুষ। শাহের পতন সোভিয়েতকে খুশি করে কিন্তু আমেরিকা মরিয়া হয়ে ওঠে ইরান-আফগান ব্লকে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় নতুন প্লেয়ার খুঁজতে। আফগানিস্তানে তারাকি-আমীন সরকার সোভিয়েতের অনুগত ছিল কারণ তারা কমিউনিস্ট। কিন্তু তারাকি সরকার যখন আরেক সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপ PDPA এর বাবরাক কার্মালের পর্চমের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়, তখন তা সোভিয়েতের মাথাব্যাথার কারণ হয়। বিশেষ করে, ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আমীন তার প্রেসিডেন্ট তারাকিকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। এই ঘটনায় সোভিয়েত সরাসরি ব্রিগেড দিয়ে কাবুল দখল করে এবং পর্চমের বারবাক কার্মালকে ক্ষমতায় বসায়।

ইরানের ইসলামিক বিপ্লবে আমেরিকা তার বন্ধু শাহকে হারিয়ে, পার্সিয়ান অঞ্চলে দিশেহারা অনুভব করে। অন্যদিকে ১৯৭৯ সালে জুহাইমান আল ওতাইবির নেতৃত্বে কাবাঘরে হামলা হয়। এই হামলা সৌদি আরবের ক্ষমতায় থাকা আহলে সৌদকে ক্ষমতার অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবতে শেখায় এবং পুরো আরবে তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাসের স্পষ্ট নিদর্শন দেখায়। আহলে সৌদ এই অবস্থায় তাদের পুরনো বন্ধু আমেরিকার সাহায্যের কামনা করে। পক্ষান্তরে আমেরিকা, আফগানিস্তানে তাদের পছন্দের লোককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সৌদি পেট্রো ডলারের সাহায্য নেয়। কমিউনিস্ট-সোভিয়াত সমর্থিত তারাকি কিংবা কার্মাল সরকারকে হটানোর জন্য সৌদি ও আমেরিকা তাদের রাজনৈতিক জোট গঠন করে।

নূর মোহাম্মাদ তারাকির সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে আফগানিস্তানের জনগণ ভালোভাবে নেয়নি। কমিউনিজমের প্রকাশ্য নেই-ঈশ্বর স্লোগান যেকোন ধর্মপ্রাণ সমাজের মতই আফগানিস্তানেও প্রত্যাখ্যাত হয়। লোকাল মৌলভি ও ধর্মীয় নেতারা এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা করলে তারাকি সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করে।

এই দমন হিতে বিপরীত হয়। আঞ্চলিক রাজনীতির আরেক কী প্লেয়ার পাকিস্তানের প্রো-ইসলামিক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তখন ক্ষমতায়। তাছাড়া পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের বহু অফিসার তখনো

আফগানিস্তানে একটি ইসলামিক সরকার দেখবার স্বপ্নে বিভোর। এরূপ পরিস্থিতিতে আফগান কমিউনিস্ট-ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে মোল্লা-মৌলভিদের যেকোন সশস্ত্র বিপ্লব পাকিস্তানের সমর্থন পায়।

১৯৭৯ সালে সৌদি আরবে জোহাইমান আল ওতায়বির নেতৃত্বে কাবাঘরে হামলা হয়। এই হামলার পর জোহাইমান আল ওতায়বির মত বহু আরবই মনে করতে থাকে ইসলামিক বিশ্বে, কিংবা ইসলামের খেদমতে আহলে সৌদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। নিজের টেরিটোরিতে যেকোন ধরণের ইসলামিক আদর্শভিত্তিক বিপ্লবের ভয় ধরে যায় আহলে সৌদ সরকারের ভিতর। সেই সময় সৌদি আরবও ইখওয়ানুল মুসলিমীন পন্থী আলেম-ওলামার উপর দমননীতি গ্রহণ করে। ইসলামিক জিহাদি ভাবধারার সাঈদ কুতুবের অনুসারীদের বিভিন্ন ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। জুহাইমান ছিল সৌদি আরবেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত গ্রাজুয়েট। তাই এই ধরণের কট্টরপন্থী ইসলামী চিন্তাধারাকে দাবিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে সৌদি আরবে কর্মরত ফিলিস্তিনি প্রফেসর আব্দুল্লাহ আযযামকে সৌদি থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

এই আব্দুল্লাহ আযযাম মূলত ওসামা বিন লাদেনের আদর্শিক ভাবগুরু। আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র থাকা অবস্থায় সৌদি ধনকুবেরের ছেলে ওসামা বিন লাদেনের পরিচয় ঘটে শিক্ষক আব্দুল্লাহ আযযামের সংগে। তিনি সৌদি থেকে পাক-আফগান সীমান্তে চলে যান এবং সেখানে বিদেশি সৈন্য ট্রেনিং এর মাধ্যমে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ আযযাম আফগান যুদ্ধের এক বিশাল কী ফিগার। তিনি ওসামা বিন লাদেনকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন ও এই যুদ্ধকে রাশিয়ান কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ধর্মযুদ্ধ 'জিহাদ' হিসেবে ফতোয়া দেন। লাদেন পরিবারের সম্পদসহ যুদ্ধে ব্যবহার করবার জন্য সম্পদ আহরণের জন্য তিনি উপমহাদেশে এবং আমেরিকান মুসলিমদের মধ্যে ক্যাম্পেইন চালান। আবদুল্লাহ আযযাম ছিলেন সর্বোপরি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে মুসলমানদের একজন আদর্শিক ধর্মগুরু।

ইরানের ইসলামিক রেভলুশন আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে সৌদিকে কিছুটা চাপে ফেলে। শিয়া ফ্রাকশনের খোমেনি গ্রুপ ক্ষমতা দখল করলে সৌদি আরব নিজেদের পৃথিবীব্যাপী ইসলামের রক্ষক হিসেবে প্রদর্শন করতে চায়। তাছাড়া সৌদি সরকারের উলামাদের প্রতি দমন নীতি অনেক উলামাকে অসন্তুষ্ট করে।

উল্লেখিত সমস্ত কারণের প্রেক্ষিতে, সৌদি আরব রাষ্ট্রীয়ভাবে আফগানযুদ্ধকে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ হিসেবে ফতোয়া দেয়। আফগানিস্তানের যুদ্ধে জান ও মাল ব্যয় করবার জন্য ওসামা বিন লাদেনের সামনে আর কোন বাঁধা থাকেনা।

বিভিন্ন ফ্রন্টে ও বহুধা বিভক্ত আদর্শে সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান এবং আরও অনেক কী প্রেশার গ্রুপের কোয়ালিশনের সমর্থনে আফগান জনগণ লড়তে থাকে সোভিয়েত আর্মির বিরুদ্ধে। তাদেরকে

আফগানিস্তান থেকে তাড়াবার লক্ষ্যে। এই পুরো গ্রুপকেই, দল, মত, আদর্শ নির্বিশেষে 'মুজাহিদীন' নামে ডাকা হয়।

ক্রমঃ ৬

২০০১ সালে আমেরিকা সরাসরি আক্রমণ করে আফগানিস্তানকে। তারপর প্রথমে বুরহানউদ্দিন রব্বানিকে ক্ষমতায় বসায় এবং অল্প কয়েকদিন পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান করে হামিদ কারজাইকে। এই কারজাই এক দশকেরও বেশি ক্ষমতায় থাকে। এগুলো পরবর্তী পর্বগুলোতে ডিটেইলস আলোচনা করবো ইন শা আল্লহ। আজ মূলত সংক্ষেপে বর্তমান আফগানিস্তানের কথা বলবো। - জুন ১, ২০১৮

২০০১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হবার পরে সম্ভবত এখনকার মত ভালো অবস্থানে তালেবান কখনই ছিলনা। এর পেছনে অবশ্যই তাদের ২য় নেতা, আমেরিকার ড্রোন হামলায় নিহত মোল্লা মন্সুরের অবদান অনস্বীকার্য। মোল্লা মন্সুরই তালেবানের অন্তর্কলহ দূর করবার জন্যে মোটামুটি নিরপেক্ষ একজন উত্তরসূরি নির্বাচন করে। হাইবাতুল্লাহ আকুন্দজাদা।

২০১৭ সালের নভেম্বারের হিসাবে আফগানিস্তানের শতকরা ৬০ ভাগ এলাকা রিপাবলিক আফগানিস্তানের অধীনে। যার প্রেসিডেন্ট আমেরিকা সমর্থিত আশ্রাফ গনি। অন্যদিকে শতকরা ১৩ ভাগ এলাকা তালেবান অধীনস্থ। আফগানিস্তানের ৪০% এলাকায় সরকারি কোন কন্ট্রোল নেই বা দুর্বল অথবা সেখানে সরকার ও তালেবানের মধ্য লড়াই চলছে।। এইসব তথ্যই আফগান সরকার সমর্থিত সূত্র থেকে নেওয়া। কাজেই বাস্তবে আশরাফ গনির সরকারের অবস্থা আরও নাজুক।

২০১৬ সালে মোল্লা মনসুরের মৃত্যুর পর থেকে তালেবান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের প্রভাব বাড়াচ্ছে। ২০১৮ সালে তালেবান অধ্যুষিত এলাকায় একটা মাদ্রাসার হাফেজ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আশ্রাফ গনির সরকার নৃশংস বিমান হামলা চালায় এবং এই হামলায় প্রায় অর্ধশতের বেশি মানুষ মারা যায় যাদের ৯৫% এর বেশি ছিল সিভিলিয়ান এবং অধিকাংশ সদ্য হাফেজ হওয়া শিশু-কিশোর। এ ঘটনাটি গনির সরকারের জন্য আত্মঘাতী হয় এবং তালেবান নেতা মৌলভী আকুন্দজাদা এর পরপরই হিংস্র এবং সহিংস হামলার ঘোষণা দেয়। 'আল খন্দক' নামের এই অপারেশনগুলোতে আফগানিস্তানের মানচিত্রে গত মাস দুয়েকেই অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অন্তত এগারোটা ডিস্ট্রিক্ট বা জেলার পতন ঘটেছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে তালেবান ব্লক করে রেখেছে এক মাস ধরে। ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী দখলের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে তালেবান।

আফগানিস্তানের সরকার এবং তালেবান দুই দলই একে অপরকে অন্যের প্রক্সি হিসেবে দোষারোপ করে। যেমন আমাদের দেশে আওয়ামীলীগ বিএনপিকে পাকিস্তানের বা আম্রিকার চর বলে আর আওয়ামীলীগকে বিএনপি বলে ভারতের দালাল।

আফগানিস্তানে কেউই কাওকে সাধারণভাবে কোন আফগানি রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়না। তবে সম্প্রতি রিপাব্লিক আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট গনি এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছে। আফগানিস্তানের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, গনি কোন শর্ত ছাড়াই ফেব্রুয়ারি মাসে তালেবানকে টেবিলে বসে আলোচনার প্রস্তাব দেয় এবং তাদেরকে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করানো হবে এমন হিন্টস দেয়। এ প্রস্তাবনা ঐতিহাসিক, কেননা এরপর গনি তালেবানকে আর টেরোরিস্ট বলতে পারবে না। তাহলে লোকে বলবে সে সন্ত্রাসীদের আলোচনার টেবিলে ডাকে।

পুরো আফগানিস্তানে গনি সরকারের দৈন্যদশা বিশ্ববাসীর কাছে আরও স্পষ্ট হয় যখন এই প্রস্তাব তালেবান প্রত্যাখ্যান করে। এর বিপরীতে তালেবান গনিকে আমেরিকার পুতুল হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তাদের আগের কথাই রিপিট করে যে, যতদিন আফগান মাটিতে বিদেশী সৈন্য থাকবে ততদিন আলোচনা হলে গনির বস আমেরিকা বা ন্যাটোর সাথে হতে পারে তবে পুতুল গনির সংগে নয়।

ফেব্রুয়ারির প্রস্তাবের বিপরীতে তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লা মুজাহিদ আফগান সরকারের পুলিশ ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয় এবং তাদেরকে নতুন জীবন সহজ করে দেবার আশ্বাস দেয় যদি তারা আমেরিকা ও আফগান রিপাব্লিকের চাকরি ছেড়ে দেয়। এই সাধারণ ক্ষমা আফগান পুলিশ ও আর্মির জন্য সুখের কিছু ছিলনা বরং এটা ছিল পরোক্ষ প্রাণনাশের হুমকি। এরপর তালেবান ঘোষণা দিয়ে সরকারি

এবং আমেরিকান নন সিভিলিয়ান ক্ষেত্রগুলোতে হামলা চালায় এবং তারা একটা উইং তৈরি করে যারা এই মিশনগুলোতে সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালটি কমানোর জন্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

তালেবান অগ্রগতিতে ট্রাম্পের ঘুম হারাম হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আফগানে আরও আমেরিকান সৈন্য বাড়াতে চায় এবং আমেরিকার আন্তর্জাতিক মিত্রদের কাছে গনির সরকারকে 'সন্ত্রাসবিরোধী' কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে আবেদন করে। জবাবে ব্রিটেন আফগানে বৃটিশ সৈন্য বাড়াবার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

সর্বশেষ কয়েকটা ঘটনা

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় একদল উলামা আবারও তাদের পছন্দের সরকারের কথায় মিলিত হয়ে সম্ভবত ১১ মে ২০১৮ তে ইসলামের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ হয়েছে। এরা পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আশ্রাফ গনির দাওয়াতে জাকার্তায় একত্র হয়ে তালেবানকে যুদ্ধের পথ ছেড়ে শান্তি আলোচনার দাওয়াত দিয়েছে।

জাকার্তার সম্মেলনের পর আফগানিস্তানের আমেরিকান কমাণ্ডার নিকোলসন দাবি করছে যে শান্তি আলোচনা অগ্রসর হচ্ছে। অপরদিকে তালেবান বলেছে যে নিকোলসন আসলে আফগানিস্তানে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে গুজব ছড়াচ্ছে।

গনির সরকার, ট্রাম্প ও তার বন্ধুরা এবং নিবেদিতপ্রাণ উলামাকে ফারিয়াবে তালেবানের অগ্রগতি আতংকিত করছে।

ক্রমঃ ৭

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (এটা মূলত ক্রম-৫ পটভূমির পরের অংশ)

১৯৭৯ সালের সোভিয়েতের আফগান আক্রমণ থেকে এই বর্ণনা শুরু করছি।

PDPA খালক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট তারাকি সোভিয়েতের থেকে প্রাপ্ত সাহায্যে খুশি ছিলনা। সে সরাসরি সোভিয়েত আর্মিকে আসতে অনুরোধ করত। তার দমন নীতি তাকে কমিউনিস্ট, ইসলামিস্ট সবার শত্রু বানিয়েছিল। অন্যদিকে রাশিয়াও তার প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ, তারাকি অন্য কমিউনিস্ট পর্চমের কার্মাল নাজিবুল্লাহদেরও নানাভাবে অত্যাচার করত। সোভিয়েত প্রথমে সরাসরি যুদ্ধে আগ্রহী ছিলনা। কিন্তু তারাকি যখন তার নিজের দলের লোক হাফিয আমিনের নির্দেশে খুন হয়, তখন সোভিয়েত মনে করে যে এই ঘটনা আফগান কমিউনিস্টদের বহুধা বিভক্ত করে দুর্বল করে ফেলবে। ইরানের ইসলামিক রিফর্ম সৌদি বা US এর মত রাশিয়াকেও আতংকিত করে। তাই মুজাহিদিনদের এমন এডভান্টেজকে বাড়তে না দিয়ে রাশিয়া আফগানে প্রবেশ করে।

আবার প্রো-রাশিয়ান সরকারকে ফেলে দিতে আমেরিকা পাকিস্তানকে সাথে নিয়ে সরকার বিরোধি গ্রুপগুলোকে ইন্ধন দিতে থাকে। এতদভিন্ন, প্রেসিডেন্ট তারাকির হত্যাকারি আমিনকে রাশিয়া বিশ্বাস করতে পারেনা। যদিও রাশিয়া প্রথমেই বুঝতে পেরেছিল যে বিদেশি শক্তির সরাসরি যুদ্ধ করা আফগানিস্তানে উলটো ফল এনে দেবে এবং তা বিরোধিদের পক্ষে জনমত ঘুরিয়ে দেবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট তারাকির প্রধানমন্ত্রী এবং হত্যাকারি হাফিয আমীনকে সোভিয়েত প্রথমেই হত্যা করে। এরপর সোভিয়েত আমীন সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে সহজেই শহর এলাকার কন্ট্রোল নিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাতে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি হয়। Communist PDPA এর পর্চম গ্রুপের প্রধান বাবরাক কার্মালকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। কিন্তু কার্মাল যখন দেখল, আফগানিস্তানের জনগণ সোভিয়েত আর্মিকে ভালভাবে নিচ্ছেনা, তখন সে যুদ্ধের সমস্ত অশান্তির দায়ভার সোভিয়েতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। অন্যদিকে গ্রাম্য এলাকায় সরকার ও সোভিয়েত কন্ট্রোল ক্রমাগতভাবে হারাতে থাকে। মুজাহিদিন গ্রুপগুলো বিদেশি শক্তির বিরোধী জনগণকে একত্রিত করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তীব্র রেজিস্টেন্স তৈরি করে।

আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে সোভিয়েতের আক্রমণকে অবৈধ ঘোষনা করে নানারকম স্যাংশন ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এদিকে তলে তলে CIA নানা রকম অপারেশন চালাতে থাকে। তারা ইসরায়েলের থেকে অস্ত্র কিনে এনে সাপ্লাই দেয়। অনেক দেশ যেমন, বৃটেন, তুরস্ক ইত্যাদি তাদের পুরোনো

অস্ত্র মুজাহিদিনদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পাকিস্তান ও সৌদিআরব এই যুদ্ধকে হলি ওয়ার তকমা লাগিয়ে মুসলিম যুবকদের অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

আফগানিস্তান সরকারের আর্মি সোভিয়েতের আগমনের পর দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্ভবত আফগান জাতীয়তাবাদ এর মূল কারণ ছিল। অন্যদিকে ছয়মাসের জন্য আসা রাশানরা বুঝতে পারে আফগানে তাদের প্রবেশের অল্প সময় পর প্রস্থান বাবরাক কার্মালকে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে দেবেনা। কেননা বিরোধি গ্রুপ তখন অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। উভয় সংকটে পড়ে যাওয়া রাশানরা নানা নিষ্ঠুর কৌশলে বিরোধিদের সাপ্লাইয়ার সন্দেহে বহু আফগান গ্রাম (মূলত এয়ারস্ট্রাইকে) তছনছ করে দেয়। এটা বাবরাক ও সোভিয়েত উভয়ের জন্য কাল হয়ে দাড়ায়। মুজাহিদিনরা নিয়মিত ভলান্টিয়ার যোদ্ধা পেতে থাকে গ্রামের পরিবার হারানোদের মধ্যে থেকে। আবার আব্দুল্লাহ আযযাম, ওসামা বিন লাদেন এবং পাকিস্তানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিদেশি যোদ্ধাদের দ্বারাও।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব থেকে বহু মুসলিম যুবক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যদিও লোকাল ফাইটারদের তুলনায় এরা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। আব্দুল্লাহ আযযাম ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে তার ফিলিস্তিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে দেশি-বিদেশি তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

সৌদি বিলিয়নিয়ার ওসামা বিন লাদেন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অস্ত্র খরিদ বাবদ এই যুদ্ধে যোগ দেয়। সে খুব দ্রুতই তার ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে মুজাহিদিনদের মন জয় করে ফেলে। এর সাথে ধর্মযুদ্ধের খাতিরে জান ও মাল ব্যয় করে সে দল-মত নির্বিশেষে আফগান মুজাহিদিনদের মনে স্থান গড়ে নেয়, যা নাইন ইলেভেনের পর তার ভাগ্যকে নির্ধারণ করে।

বিদ্রোহি যোদ্ধারা অনেকটা এখনকার সিরিয়ার মত বহুধা বিভক্ত ছিল। অবশ্য শুরুতে তারা নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়াত না। কিন্তু পরে রাশিয়া আফগান সরকারের ইন্টেলিজেন্স উইংকে কাজে লাগিয়ে এদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

সমস্ত গ্রুপগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড়টা ছিল জমিয়াত-এ-ইসলামির কমান্ডার আহমেদ শাহ মাসুদের। পানশিরের এই সিংহ পুরুষ আফগান যুদ্ধে সাহসিকতার জন্যে সাধারণ আফগানদের মনে জায়গা করে নেয়। সে ছিল জমিয়াতের নেতা বুরহানউদ্দিন রব্বানির অনুসারী। বুরহানউদ্দিন তার আদর্শগত দিক থেকে ভারতের ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল আলা মওদুদি দ্বারা প্রভাবিত ছিল।
আরেকটা বড় গ্রুপ ছিল গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিযব-ই-ইসলামী। গুলবুদ্দিন মূলত প্রাথমিক জীবনে জমিয়াতের সাথে থাকলেও পরে বেরিয়ে আসে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে হেকমতিয়ারের দল এবং মত পরিবর্তনের ইতিহাস তাকে কীভাবে আজ পর্যন্ত রহস্যময় করে রেখেছে। হেকমতিয়ারের সাথে

সন্ধি করেনি এমন গ্রুপ আফগানিস্তানে কম ছিল। আবার প্রভাব বিস্তারের জন্য মুজাহিদিন গ্রুপকে আক্রমণেও হেকমতিয়ার ছিল সরেস।

আরেক প্রভাবশালী মুজাহিদিন মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদি আরেকটা মাঝারি সাইজের গ্রুপের নেতা। সে মূলত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইকে ফোকাস করে এবং নিজেদের লড়াইকে বন্ধ করবার চেষ্টা করে। বহু তালেবান তার ছাত্র এবং তার আন্ডারে যুদ্ধও করেছে।

আরেকটা গ্রুপের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তা হল জালালউদ্দিন হক্কানির হক্কানি নেটওয়ার্ক। জালালউদ্দিন হক্কানির ছেলে সিরাজউদ্দিন বর্তমান তালেবানের ২য় বা ৩য় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। হাইবাতুল্লাহ আকুন্দজাদার পর মোল্লা ওমরের ছেলের ও সিরাজের পজিশন বা র‍্যাংক প্রায় একই। যদিও অফিশিয়ালি সিরাজ ২য়।

সোভিয়েত খুব দ্রুতই আফগান গ্রামে ভিলেইন হিসেবে আবির্ভূত হয়। লোকাল ওয়ারলর্ডদের আক্রমণ পরিচালনার কেন্দ্র ছিল বিভিন্ন গ্রাম। সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে সোভিয়েত এইসব গ্রামে এয়ারস্ট্রাইক চালাতো, ফসল পুড়িয়ে দিত, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে গ্রামবাসীকে বন্দি করে গোয়েন্দা তথ্যের জন্য সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করত, যা বাবরাক কার্মালের সরকার বিরোধি আফগানের সংখ্যা দিন কে দিন বাড়িয়েই চলেছিল।

যদিও সৈন্য মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মুজাহিদিনদের অনেক বেশি, প্রায় চার থেকে পাঁচগুণ। যদিও রাশান ও আফগান সরকারের মোট সৈন্য সংখ্যাও মুজাহিদিনদের তিনগুণ ছিল। সোভিয়েত এবং তাদের পুতুল কার্মাল আফগানিস্তানে শান্তি বা কন্ট্রোল কোনটাই আনতে পারেনি।

রাশিয়া অচিরেই বুঝতে পারে যে, আফগানিস্তানে নিজেদের সরকার বসিয়ে troops সরিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। ক্রমাগত গ্রাম ধ্বংসের স্ট্রাটেজি, গোয়েন্দা লেলিয়ে বিরোধিদের আপোসে লড়িয়েও সরকারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছেনা। বরং দখলকৃত টেরিটরিতে সৈন্য কমিয়ে দিলেই বেদখল হয়ে যাচ্ছে। যদিও মোট ১০ বছর সেখানে অবস্থান করে, কিন্তু রাশিয়া এর মাঝামাঝি পিরিয়ড থেকেই আফগান হতে সম্মানজনক এক্সিট খুঁজতে থাকে এই ভেবে যে পরাজয়কে কূটনৈতিক চাল চেলে ধামাচাপা দেওয়া যায় কিনা। বারবাক কার্মাল মূলত রাশিয়ানদের পুতুল বলা যায়। রাশিয়ান এক্সিটের শুরুর দিকেই নিজ দলের নাজিবুল্লাহ তাকে সরিয়ে ১৯৮৭ সালে ক্ষমতা দখল করে।

ক্রমঃ ৮

১৯৯৬ সালে মাসুদ ও বোরহান রব্বানির জমিয়াত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে তালেবান। আফগানিস্তান Islamic state of Afghanistan থেকে পরিবর্তিত হয় ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানে। তালেবানের অবিসংবাদিত নেতা মোল্লা ওমর দেশের নেতৃত্বে আসে।

মাসুদ কিংবা বোরহানের সরকার কি পুতুল সরকার ছিল? না। বরং মাসুদের জমিয়াত সরকার ছিল আমেরিকা সমর্থিত, আমেরিকার পুতুল নয়। পরবর্তীতে আমরা পুতুল সরকার বলতে কী মনে করি সেই আলোচনা করবো ইন শা আল্লহ।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মোল্লা ওমর ও তার তালেবান প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আফগান যুদ্ধ থেকে শুরু করে ক্ষমতার শেষ দিন পর্যন্ত মাসুদ ছিল আমেরিকার বিশ্বাসভাজন। মুজাহিদিন যোদ্ধা হিসেবে মাসুদ ছিল এক নম্বর কী প্লেয়ার আর সরকার হিসেবে মাসুদের সরকার আমেরিকা ও তার কলিগদের কাছে ছিল স্বস্তির।

মাসুদ কমিউনিস্ট ছিলনা। বরং কমিউনিস্ট হটিয়ে সে ক্ষমতা দখল করে। মাসুদ ইসলামী সিম্প্যাথাইজার ছিল, কিন্ত মৌলিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মাসুদ সরকারের তেমন ভূমিকা না থাকায় আফগান যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে মাসুদ আমেরিকার প্রিয়পাত্র হয়।

আমেরিকা জানতো যে, যুদ্ধ করা অসংখ্য যোদ্ধা গ্রুপ তখন আফগানিস্তানে বিদ্যমান। এই গ্রুপগুলো ওসামা বিন লাদেন ও তার গুরু আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযামের ছড়ানো জিহাদী অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত। তাছাড়া উপমহাদেশীয় উলামাদের ব্যাপক চাপ ছিল কমিউনিস্ট হটিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার। তাই সরাসরি সেক্যুলার ডেমোক্রেসি ও প্রকৃত ইসলামিক সরকারের মাঝামাঝি আহমেদ শাহ মাসুদের সরকার আমেরিকার ছিল প্রথম পছন্দ।

পানশিরের সিংহ, ব্যক্তিত্ববান সুপুরুষ আহমেদ শাহ মাসুদের সরকার ৪ বছরের মত ক্ষমতায় ছিল। এরপর আসে অপেক্ষাকৃত ইসলামপন্থী তালেবান। তালেবান ২০০১ সালের শেষের দিকে সরাসরি আমেরিকার সৈন্য ও জেনারেলদের কাছে রাজধানী ছেড়ে দিয়ে insurgent হয়ে যায় এবং গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতে থাকে। তাদের এই প্রচেষ্টায় তারা একে একে অনেক বন্ধু হারাতে থাকে। কেননা ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা বা রাশিয়ার বন্ধু নয়, এমন কাওকে সাহায্য করার অর্থ 'সন্ত্রাস'।

তালেবান সরকারের উচ্চপদস্থরা ছিল সোভিয়েতের ত্রাস, আর আমেরিকার বন্ধু মাসুদের শত্রু। তাদের মূলমন্ত্র ছিল স্থানীয় উলামাদের স্বপ্নের ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্ঠা। বন্ধুহীন বছরগুলো আফগানিস্তানের পাহাড়ে কাটিয়ে, ১৫ বছরের দীর্ঘ স্ট্রাগলের পর ২০১৬ সাল থেকে মৌলভি হাইবাতুল্লাহ আকুন্দজাদার নেতৃত্বে তালেবান ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে, যা আঘাত হানে বহু রাষ্ট্রের স্বার্থে।

২০০১ সালে আমেরিকা যখন আফগান আক্রমণ করে, তখন বাইরের ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর তেমন কোন এক্টিভিটি ছিলনা। আফগানিস্তানে তখন আমেরিকা তার পুতুল সরকার (প্রথমে বোরহানউদ্দিন) হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক এবং অনৈসলামিক সরকার গঠন করে। এই হামিদ কারজাইকে সিলেক্ট করা হয় জার্মানিতে বসে। কারজাইয়ের সরকারকে কার্যত ইন্সটল করে আমেরিকা। বিগত ১৭ বছর ধরে কারজাই ও আশ্রাফ গনির সরকারকে কার্যত প্রোটেকশান দিয়ে আসছে আমেরিকার জেনারেলরা। এরা আফগানিস্তানের মানুষের রক্ত ও ঐতিহ্যের বিনিময়ে ও পরাধীনতার গ্লানিতে চূর্ণ করে আশ্রাফ গনিদের পুতুল সরকারকে টিকিয়ে রাখছে।

এই উপমহাদেশ থেকে শুরু করে সৌদি আরবের উলামারা অনেকে আফগানিস্তানে আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছেন। তবে তারা সংখ্যায় অনেক নন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সৌদি ও পাকিস্তানে ধীরে ধীরে তালেবান নিয়ে আলোচনা ট্যাবুতে পরিণত হয়। পাকিস্তান তাদের অযোগ্য সামরিক শাসক পারভেজের আমলে তালেবান সরকারের সঙ্গে শেষ সূতোটি ছিড়ে ফেলে লাল মসজিদ হামলার মাধ্যমে। পাকিস্তানের সেনাশাসক পারভেজ তার পূর্বসুরি জিয়াউল হকের মত সাহসী ছিলনা, সে ছিল কাপুরুষ।

সৌদি আরবও আফগানিস্তান নিয়ে আর কোনদিন মাথা ঘামায়নি। বস্তুত এই সরকারগুলো তাদের দেশীয় বিরোধীদের নিয়ে চিন্তিত ছিল। সৌদি তার রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে আমেরিকার নুন খায় ও তাদের ইন্টেলিজেন্স পয়সা দিয়ে কেনে।

ক্রমঃ ৯

আফগানিস্তান। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা আর উপত্যকায় ভরা এই দেশ। বহু সুপারপাওয়ারের কাছে অপরাজেয় আফগানদের গর্ব এই দেশ।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই অপরাজেয় দেশের রাজধানী কাবুল, সোভিয়েত রাশিয়ার অধীনস্থ হয়ে যায়। হাফিযুল্লাহ আমীনকে হত্যা করে রাশিয়া ইন্সটল করে পুতুল বাবরাক কার্মালকে।

১০ বছর ধরে মূলত ইসলামপন্থি Warlord দের হাতে মার খেয়ে পড়িমরি করে আফগান থেকে পালিয়ে বাঁচে রাশিয়া। আফগান পুনরায় স্বাধীন হয়। রাশিয়ার ছেড়ে যাওয়া নাজিবুল্লাহ সরকারের খুব তাড়াতাড়িই পতন হয়। কাবুলের মসনদে আসে জেনারেল আহমেদ শাহ মাসুদ ও বোরহানউদ্দিন রব্বানির সরকার। মোটামুটি ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তালেবান দ্বারা হটানোর আগ পর্যন্ত এরাই ছিল কাবুলের হর্তাকর্তা।

১৯৯৬ সালে তালেবান আমেরিকাকে অসন্তুষ্ট করে ও মাসুদকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসবার পর তারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির আশায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু আমেরিকা বা তার দোসরেরা তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদকে সৌদি ও স্থানীয় দেওবন্দি সমস্ত উলামা ইসলামিক ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন। সৌদি বিলিয়নিয়ার ওসামা বিন লাদেন এই যুদ্ধে তার নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেয়।

সৌদির সুখের জীবন ছেড়ে জান ও মাল ব্যয় করা ক্যারিশমাটিক ফিগার ওসামা খুব সহজেই আফগান যোদ্ধাদের মন জয় করে নিতে সমর্থ হয়। আফগান নেতাদের অনেকে তাকে অন্য আফগান গ্রুপের নেতার চাইতেও বেশী ভালোবাসত, গুরু মানত। ওসামা এই যুদ্ধ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং মিলিটারি ধারণা লাভ করে তার গ্লোবাল ধর্মযোদ্ধাদের গ্রুপ আল কায়িদাতুল জিহাদ গঠন করে।

ওসামা আফগানিস্তানে কত সম্পদ ব্যয় করে তার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে এই ঘটনায়; হেরাতে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার জন্য ওসামা আবু মুসাব যারকাউইকে বাংলাদেশি মূল্যে প্রায় ২ কোটি টাকা দেয়। অথচ আমার জানামতে ওসামা এর আগে যারকাউইর সাথে দেখাও করেনি।

ওসামার আল কায়েদার ধর্মীয় বায়াত ছিল তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের কাছে। এদিকে আমেরিকা বরাবরই তার প্রিয়পাত্র মাসুদ ও বোরহানকে ক্ষমতায় দেখতে চাইত। ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বার ছদ্মবেশী আত্মঘাতী বোমা হামলায় মাসুদ মারা যায় এবং ১১ সেপ্টেম্বার টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা ঘটে। দুটো ঘটনাতেই আমেরিকা ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়েদাকে দায়ী করে এবং মোল্লা ওমরকে নির্দেশ দেয় বিন লাদেনকে ধরে দেবার জন্য।

নাইন ইলেভেন নিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভাবনা অন্য আরেকদিন লিখবো যদি আল্লাহ চান। আমার জানামতে নাইন ইলেভেনের পর নিচের ঘটনাগুলো ঘটে।

মোল্লা ওমর আমেরিকাকে বিন লাদেনের বিচার করবার আশ্বাস দেয়। তালেবান সরকারের অধীনে আফগানিস্তানে ইসলামিক আইনে ওসামার বিচার করবার কথা আসে। তবে তার আগে তদন্তে প্রমাণ করবার বিষয় আসে ওসামা আসলেই এই ঘটনায় জড়িত ছিল কিনা। কিন্তু মোল্লা ওমরের তদন্তে আল কায়েদা কিংবা বিন লাদেন টুইন টাওয়ারে হামলা অস্বীকার করে।

আমেরিকা তার জনগণের উপর হামলার কারণে এক ধরণের অহংকার নিয়ে মোল্লা ওমরের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সর্বশেষ মোল্লা ওমর আমেরিকার কাছে এই হামলার প্রমাণ চায়। আমেরিকা সেটাও দিতে অস্বীকার করে এবং ওসামাকে নিঃশর্তভাবে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে।

স্বল্পভাষী মোল্লা ওমরের এটা বুঝতে বাকি ছিল না যে আমেরিকার নির্দেশ অমান্য করার ফলাফল আফগানিস্তানে সরাসরি আমেরিকার আক্রমণের নামান্তর। সাথে এটাও কারো অজানা ছিল না যে ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া তার জীবননাশের সমান।

ওমর তার উচ্চপদস্থ তালেবান অফিশিয়ালদের সাথে পরামর্শ করে। এই অফিশিয়ালগন বিন লাদেনকে সোভিয়েত যুদ্ধ থেকে চেনে। তাদের অধিকাংশের বক্তব্য ছিল ধর্মীয় আবেগ দিয়ে ভরাঃ "ওসামা আমাদের মুসলিম ভাই। আমরা তার সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সোভিয়েত তাড়িয়েছি। এখন কাফের আমেরিকার হাতে তাকে তুলে দেওয়া কী করে মিল্লাতে মুহাম্মাদি অংশ হতে পারে? আমরা প্রয়োজনে যে কোন ফলাফলের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু নিজের ভাইয়ের জীবন বিপন্ন হতে দেবোনা।" মোল্লা ওমরও তার কমান্ডারদের সাথে একমত ছিল।

নাইন ইলেভেনের পর যে এত তাড়াতাড়ি আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমেরিকার মিলটারি মাইটের কাছে আফগানিস্তানের কারিশমা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মোল্লা ওমর তার স্বপ্নের পরিসমাপ্তি দেখছিল এবং সেই যে আফগানিস্তানের প্রাণ, কাবুলের মসনদ ছেড়ে গিয়েছিল, জীবদ্দশায় সে তা আর দেখে যেতে পারেনি।

আফগানিস্তানে মোল্লা ওমররা সোভিয়েত যুগের পতন ঘটিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকান Invader দের হাতে স্বাধীনতার সূর্যকে পুনরায় অস্তমিত হয়ে থাকতেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল ওমরকে। সেটা অবশ্য আরও ১৪ বছর ধরে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্ট্রাগলের পরে।

ক্রমঃ ১০

২০০১ সালে তালেবান সরকারকে উৎখাত করার পর আমেরিকা প্রথমে বোরহানুদ্দিন এবং পরে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত একটা কনফারেন্সের মাধ্যমে হামিদ কারজাইকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। কারজাইয়ের সরকার ছিল মূলত পুতুল মীর জাফরের সরকার। এই গণতান্ত্রিক সরকার ছিল রাশিয়ার ইন্সটল করা বাবরাক কার্মালের অনুরূপ সরকার। সেই কারজাই বা তার পরের পরাধীন সরকারগুলোকে আজও আমেরিকা তার সৈন্যসামন্ত দিয়ে প্রটেকশন দিয়ে যাচ্ছে, আর তারা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে আমেরিকার এজেন্ডা।

আপনি যদি একজন সাধারণ মুসল্লি হয়ে থাকেন বাংলাদেশের, তাহলে আপনি জানেন এদেশে একটা তথাকথিত ওলামাগোষ্ঠী বিদ্যমান যারা সৌদি আরবকে আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। এরা কখনই আপনাকে বর্তমানে আশরাফ গনির সরকার কী করছে তা বলবেনা। এরা এও বলবেনা লাল মসজিদের হিরো গাজী কেন পাকিস্তানি আর্মির সাথে যুদ্ধ করে মরেছিল। বলবে না কী করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ কিছুদিন পর আমেরিকার বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসে' পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এরা আপনাকে সুযোগ পেলেই মোল্লা ওমর বা তালেবানের ব্যাপারে দুটো কটু কথা শুনিয়ে দিতে পিছপা হবে না। আমেরিকার আফগান ছাড়া নিয়েও এদের তেমন কোন মাথাব্যাথা নেই, কারণ তারা হলো আহলে সৌদ পন্থি।

সৌদিআরব রাজনৈতিকভাবে অনেক আগে থেকেই আমেরিকাপন্থি। সেই আলোচনা আগের তালেবান সিরিজে করা হয়েছে। আহলে সৌদ যেকোন ইসলামিক পলিটিকাল মুভমেন্টকেই তাদের লাভ ক্ষতির হিসাবে দেখতে চায় নিজেদের মসনদ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। ১৯৭৯ সালে জুহাইমান আল ওতায়বির দ্বারা কাবা আক্রান্ত হবার পর সৌদি উলামা ফিল্টার করা শুরু করে। আরব বসন্তের ছোঁয়া থেকে বাঁচতে এই দশকে আরও মরিয়া হয়ে আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ায়।

২০০১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তালেবানদের জন্য আজকের মত সুসময় আর কখনও আসেনি। মোল্লা ওমরের মৃত্যুর পর তালেবানদের অভ্যন্তরে নেতৃত্ব নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ২০১৫ সালে মোল্লা মনসুর অফিশিয়াল নেতৃত্বে আসলেও মোল্লা ওমরের মত কারিশমা তার ছিলনা। কিন্তু মনসুর উত্তরসূরি নির্বাচনে অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। আমার বিচারে সেটাই তালেবানকে আজকের জায়গায় নিয়ে গেছে।

মোল্লা আখতার মনসুর তার মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ এবং ঠাণ্ডা মাথার মৌলভি হাইবাতুল্লাহ আকুন্দজাদাকে নেতা নির্বাচন করতে নির্দেশ দেয়। সাথে ২য় ও ৩য় প্রধান দলনেতা বানায় জালালউদ্দিন হক্কানির ছেলে সিরাজ ও মোল্লা ওমরের ছেলে ইয়াকুবকে। এতে তালেবান তার অভ্যন্তরীণ ঝামেলাগুলো কাটিয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

২০১৮ সালে যুদ্ধরত নয় এমন সিভিলিয়ান মৃত্যু কমানোর জন্য তালেবান নিজস্ব কমিশন বানায়। এবং বিশেষ করে এই বসন্তে আল খন্দক নামে তারা বহু ডিসাইসিভ অপারেশন চালায়। এতে কাবুল সরকারের ভিত নড়ে যায়।

সৌদি বা পাকিস্তান কখনই আমেরিকার আফগান আক্রমণ নিয়ে সোচ্চার ছিলনা। উলামাদের একত্রিত করে আমেরিকার বিরুদ্ধচারণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পাকিস্তানি আর্মির তেহরিকের বিরোধ পাকিস্তানে তালেবান বিরোধি মনোভাব প্রবল করে তোলে। ২০০২ বা তার পরের কিছু সময় আড়ালে আবডালে কিছু মানুষ এবং উলামা আফগানিস্তান বিষয়ে কথা বললেও পরবর্তী সময়ে তালেবান কেন্দ্রিক যে কোন বিষয় একরকম ট্যাবু হয়ে যায়।

মিলিটারি মাইটের হাতে তালেবানের পরাজয় অনিবার্য - এমন ধারণা ছিল অনেক উলামা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামা তার ২য় টার্মে ক্ষমতায় আসবার পর ২০১৪ সালের ভিতর আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সকল সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে দেশের বাইরে সেনা পাঠানো যেকোন সরকারের জন্যই প্রচুর খরচের ব্যাপার। কিন্তু আফগানিস্তানের সেই সময়কার পরিস্থিতি (২০১৪) ততটা অনুকূলে ছিলনা আমেরিকার যতটা ছিল আশা।

ওবামা সেনা প্রত্যাহার না করলেও ট্রাম্পের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের বাইরে আমেরিকার খরচ কমাবার একটা বিষয় খুব কড়াভাবে উল্লেখ ছিল। ট্রাম্প তাই চাইবেই ২০২০ সালের US নির্বাচনের আগে আফগানিস্তান বিষয়ে ক্লিয়ার কোন উত্তর।

গনির উপর প্রেশার ছিল আমেরিকান সৈন্যের উপর নির্ভরতা কমানোর। কিন্তু আল খন্দক অপারেশনে অসহায় গনি এখন আরও কিছু বৃটিশ সৈন্যের সহায়তা চাচ্ছে তার পরাধীন মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য।

কাবুলে আমেরিকার পুতুল সরকার যখনই খারাপ অবস্থায় গেছে তখনই তারা তালেবানকে আলোচনার টেবিলে ডেকেছে এবং আলোচনার শর্ত শিথিল করেছে। সর্বশেষ আশরাফ গনি নিঃশর্ত আলোচনার প্রস্তাব পেশ করে যেটা তালেবান প্রত্যাখ্যান করে দেয়। তাদের কথা হল গনির সরকার পুতুল, ন্যাটো বা আমেরিকার প্রক্সি। আলোচনা হলে আমেরিকার সাথে হবে, প্রক্সির সাথে নয়।

এদিকে আমেরিকা তালেবানকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যায়িত করে এসেছে। যেহেতু সন্ত্রাসীদের সাথে কোন সভ্য মানুষ আলোচনায় বসতে পারেনা আর বসলেও পরে তাকে আর সন্ত্রাসী বলতে পারবেনা; এই উভয় সংকটে আফগানিস্তানে আলোচনা হবার পথ রুদ্ধ হয়ে আটকে আছে। আর ওদিকে তালেবান তো প্রতিদিন অগ্রসর হচ্ছেই।

আলোচনা হলে সবচাইতে লাভ গনির সরকারের। কেননা বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে গনির সরকার বেশিদিন টিকবেনা। আমেরিকার ট্রাম্প বড় কোন যুদ্ধের খরচ নেবেনা, তাই সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে গনিদের জীবন বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে। তাই তড়িঘড়ি করে শান্তি আলোচনার জন্য আমেরিকা ও গনি সরকার উভয়ই বেছে নিয়েছে আফগানিস্তানের পুরনো প্লেয়ার সৌদি আরবের মধ্যস্থতাকে।

সৌদি উলামার (এমনকি সরকারপন্থি হলেও) একটা গ্রহণযোগ্য নেটওয়ার্ক আছে সারাবিশ্বে। এটা হল পেট্রো-ইসলাম। আমেরিকা এবং গনি চাইছে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তালেবানকে প্রেসার দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসাতে। তারা সারাবিশ্ব থেকে ফরিদ উদ্দিন মাসুদের মত বিতর্কিত লোক দিয়ে কিছু মুখস্থ সরকারি বুলি আওড়ানোর জন্য গত ১০ ও ১১ জুলাই এক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করে বিশ্ববরেণ্য ক্বারী আব্দুর রহমান সুদাইস। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় দেওবন্দি-কওমি ঘরানার ফরিদউদ্দিন মাসউদ। এই ধরণের আরেকটা সম্মেলন এর আগে জাকার্তায় হয়েছিল।

আসলে এইসব সম্মেলনের আসলেই তেমন কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই, কেননা এগুলো রাজনৈতিক। তুরস্কের এফেন্দি, উমাইয়াদের পোষা টিয়া কিংবা আব্বাসীয় খলিফা মামুনের অধীনস্থরা ঠিক এরকম ভাষায়ই শাসকের কর্মকাণ্ডকে কুরআন আর হাদিস দিয়ে সাব্যস্ত করত, এ আর নতুন কিছু নয়।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদেরা এইসব শাসকের আনুগত্যকে অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আপনি কি একটা আলেমের নাম জানেন, যে ইমাম আহমদের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিল?

রহিমাহুমুল্লহ। হাদা-নাল্লহ।

ক্রমঃ ১১ - এক নিঃশ্বাসে তালেবান

আফগানিস্তানঃ ১৯৭৮ থেকে ২০১৮: ৪০ বছর

'৭০ এর দশক। কাবুল।

উপমহাদেশের মত আফগানিস্তানেও বাম চিন্তাধারা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। রাজধানী এবং অন্যান্য বড় শহুরে এলাকার শিক্ষিত মানুষের ভেতরে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেতনা তখন বিরাজমান। কিন্তু রুরাল আফগানিস্তান তখনও তাদের এথনিক, পার্সিয়ান এবং ইসলামী চিন্তাধারা বজায় রেখেছে।

সোভিয়েতপন্থি একটা দল যখন রাজধানীর মসনদ দখল করে, তখন গ্রামে গ্রামে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মূলতঃ বিপন্ন কমিউনিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সোভিয়েত রাশিয়া তাদের 40'th army দিয়ে রাজধানী দখল করে। খর্ব করে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা। ক্ষমতায় বসে কমিউনিস্ট পাপেট, বাবরাক কার্মাল।

আফগানিস্তানের দুর্গম এলাকা, ইতিহাসে তাকে একটা আলাদা জায়গা দিয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড সুপার পাওয়ারদের অনেকেই আফগান দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে তাদের সৈন্যবাহিনি। দুর্গম এলাকায় আশ্রয় নিয়ে, গেরিলা টেকনিকের মাধ্যমে আফগানদের প্রতিরোধ সোভিয়েতকেও বিপদে ফেলে দেয়। শহুরে এলাকার বাইরে কমিউনিস্ট সরকারের দখল ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে।

সোভিয়েত বিরোধী পরাশক্তি আমেরিকা যেকোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের পতন চাইত। অন্যদিকে ধর্মীয় নেতাদের ভিতরে কমিউনিস্ট নেই ঈশ্বরবাদের চেতনা খুব অস্বস্তিকর। এর ফলস্বরূপ, বহিরাগত শক্তির দ্বারা সমর্থিত ইসলামবিরোধী কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আমেরিকা তার বন্ধু মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোকে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত করবার চেষ্টা করে।

মুসলিম দেশগুলোর হকপন্থি আলেমসমাজ, কমিউনিস্ট রাশিয়াকে আফগান থেকে উতখাত করাকে জিহাদ আখ্যায়িত করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ছুটে আসে মুসলিম যুবকেরা। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ভারত উপমহাদেশ (বাংলাদেশসহ) থেকে। কওমি মাদ্রাসাগুলো এক্ষেত্রে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের যুদ্ধে পাঠাবার নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে সৌদি রাষ্ট্রীয় উলামা পরিষদও এই যুদ্ধকে জিহাদ হিসেবে ফতোয়া দেয়। সৌদি বিলিয়নিয়ার ওসামা বিন লাদেন তার বিলিয়ন

ডলারের সম্পদ ব্যয় করে অস্ত্র কেনবার আর ট্রেনিং ক্যাম্পের পেছনে। সে নিজেও এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

সোভিয়েতযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গ্রুপগুলো বহুধা বিভাজিত হলেও তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাবোধ ছিল প্রবল। যুদ্ধের মুজাহিদিন গ্রুপগুলোর মধ্যে জমিয়তের আহমেদ শাহ মাসুদের গ্রুপ সবচাইতে প্রভাবশালী ছিল। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, জালালুদ্দিন হক্কানির হক্কানি নেটওয়ার্ক, মোহাম্মাদ নবি মোহাম্মাদির গ্রুপ ছিল অন্য অনেকগুলোর মধ্যে বড়। প্রত্যেক গ্রুপই কমবেশি বিদেশী সহায়তা পেয়েছে। রাশিয়ার প্রস্থানের আগে ওসামা বিন লাদেন মোটামুটি সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। মোল্লা ওমর এই যুদ্ধে আর্টিলারি যোদ্ধা হিসেবে এক চোখ হারায়। পরবর্তীতে গঠিত হওয়া তালেবানদের অনেকেই ছিল মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদির গ্রুপে।

যুদ্ধের শেষের দিকে মাসুদ আমেরিকার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

জিহাদি আবেগ, দুর্গম আফগানি জনপদ, বিদেশী সাহায্য, লোকাল সমর্থনের অভাবে, প্রায় এক দশক চেষ্টার পরেও রাশিয়া বিদায় নেয়।
১৯৯২ সালে আহমেদ শাহ মাসুদ কাবুলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। কিন্তু রাশান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহু দলের একমাত্র প্রতিনিধি হতে কাবুলের সরকার ব্যর্থ। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জের ধরে হেকমতিয়ারের সংগে মাসুদের বিরোধ হয়। ধীরে ধীরে আবারও গ্রাম্য এলাকাগুলো কেন্দ্রের সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মাসুদ ছিল মধ্যমপন্থি। সে একই সংগে ইসলামিক ব্যবস্থা চালু করবার কথা বলত, আবার আমেরিকা এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে অনেক ক্ষেত্রেই সমঝোতার আশ্রয় নিত। এককথায় মাসুদ, উপমহাদেশীয় উলামার আকাঙ্ক্ষিত ইসলামিক সরকার তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। তবে মুজাহিদিন লিডার হওয়া সত্ত্বেও মাসুদ জাতিসংঘ থেকে স্বীকৃতি পায়। এর কারণ সেই আমেরিকা। তবে মাসুদ কখনই আমেরিকার পাপেট ছিলনা। সে ছিল ব্যক্তিত্ববান, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক, সুকুমার এবং দুঃসাহসী বীর।

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে, রাশান যুদ্ধের ওয়ার্লর্ডেরা তাদের অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে। আইন ব্যবস্থা হয়ে যায় চুরমার। প্রায় দেড় দশকের যুদ্ধে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আমেরিকার সাহায্য আসে। কিন্তু আইনের শাসনের দুর্বলতা থাকায় তা গ্রামে পোঁছে না।

সম্ভবত কান্দাহার প্রদেশের প্রত্যন্ত্য গ্রাম। কেন্দ্রের মাসুদ সরকারের নিয়ন্ত্রণ শূন্য। এক তথাকথিত মুজাহিদিন ওয়ার লর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় একদিন দুটো মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় একটা অস্ত্রধারী গ্রুপ।

দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিরক্ত কয়েকজন মাদ্রাসাছাত্র এই ঘটনায় ফুঁসে ওঠে। তারা তাদের সোভিয়েত যুদ্ধের অস্ত্র বের করে অভিযান চালায় এবং মেয়ে দুটোকে মুক্ত করে। এই সাহসী অভিযানের ঘটনা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতা আর স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাস্তানিতে বিরক্ত জনগণ, এই নতুন গ্রুপটিকে উদ্বুদ্ধ করে আরও সংগঠিত হবার। গ্রুপের প্রথম অভিযান পরিচালনাকারী লিডার মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে এক নতুন অপ্রতিরোধ্য দল তৈরি হয়। তালেবান।

মাদ্রাসা ছাত্রদের ইথিক্স, ন্যায়ের সপক্ষে আর অন্যায়ের বিরোধিতায় মুগ্ধ হয়ে বহু যুবক তালেবানে যোগ দেয়। তারা এক নতুন, ইসলামিক আফগানিস্তানের স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন সোভিয়েত যুদ্ধের সময় অনেক উলামা দেখেছিলেন। দুর্বার গতিতে তালেবান একে একে বহু ডিসট্রিক্টের আঞ্চলিক ওয়ার লর্ডকে পরাজিত করে কাবুলের মাসুদের জন্য একক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

মোল্লা ওমর বুঝতে পারে, কাবুলের মসনদ তার জন্য অত্যন্ত ভারী। তাই মাসুদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবার আগে এক বিশাল উলামা সম্মেলনের মাধ্যমে সে নিজের নেতৃত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। এই উলামা তাকে বিশ্বাসীদের নেতা 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত করে, এবং যেকোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাথে থাকবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৯৬ সালে কাবুলের মসনদ মোল্লা ওমরের অধীনস্থ হয়। পাঞ্জেশিরের সিংহপুরুষ মাসুদ কাবুল থেকে সরে গিয়ে পাঞ্জেশির বা তার আশেপাশের এলাকা থেকে তালেবানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করে। মাসুদ আমেরিকার সাহায্য পেয়েছিল তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অথবা একদিন আগে পর্যন্ত। দীর্ঘ অগ্রযাত্রায়, মোল্লা ওমরকে পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স আই এস আই এর কিছু অফিসার প্রাণপণ সাহায্য করে, বিশেষ করে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে। সোভিয়েত যুদ্ধের বড় গ্রুপ হক্কানি নেটওয়ার্কের জালালউদ্দিন হক্কানি তালেবানের সাথে ছিল। মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদি নীরব সমর্থন প্রকাশ করে।

তালেবান আফগানিস্তানের মোটামুটি সম্পূর্ণ কন্ট্রোল পায় বলা যায়। রাজনৈতিকভাবে এত বিশাল কন্ট্রোল '৭০ দশকের পর কেউ পায়নি। রাজনৈতিকভাবে মোল্লা ওমরের সরকার তাই সফল বলা যায়। দেশে ইসলামী আইন চালু হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তালেবানদের এই সফলতার পেছনের কারণ আমার মনে হয় একটি। সেটা হল তালেবানের আগের সমস্ত সরকারের এপ্রোচ ছিল টপ টু বটম। তারা কাবুলের মসনদ দখল করে পরে লোকালিটি শাসনের চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে তালেবান লোকালিটি থেকে উঠে আসা পপুলার গ্রুপ। বটম থেকে টপের দল। শহুরে কমিউনিস্ট বা সেকুলাররা অবশ্য তালেবানের ইসলামিক শাসনে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করতে থাকে।

কিন্তু পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তালেবান সরকার তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। আমেরিকা তালেবানের ইসলামি ঘরানার ইমারতের বিরোধি ছিল। তারা তালেবানকে স্বীকৃতি দিতে নানা গড়িমসি করে। ইউরোপও তাই। আমেরিকার বন্ধু সৌদি আরব, হঠাৎ আফগান থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। আমেরিকা সহয়তা করতে থাকে মিত্র মাসুদকে।

তালেবান অর্থনৈতিক সফলতার অন্তরায় ছিল একটা সিদ্ধান্ত। দুই দশকের বেশি ধরে চলে আসা যুদ্ধবিদ্ধস্থ দেশে মোল্লা ওমর পপি চাষ নিষিদ্ধ করে। পপি থেকে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য তৈরি হত। আফগান অর্থনীতির একটা বড় অংশ এর উপর নির্ভরশীল ছিল।

২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আহমেদ শাহ মাসুদ খুন হয়। ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলা হয়। এই দুই হামলার পেছনেই আমেরিকা আল কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। তালেবানকে বলে ওসামা বিন লাদেনকে আফগান থেকে নিঃশর্তে আমেরিকা পাঠাতে। উল্লেখ্য, ওসামা সেই সময় আফগানিস্তানে অবস্থান করে তার গ্লোবাল ধর্মযোদ্ধাদের নেটওয়ার্ক আল কয়িদাতুল জিহাদ অপারেট করছিল।

মোল্লা ওমর দুটো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করে এবং আমেরিকাকে ওসামার জড়িত থাকার প্রমাণ দিতে বলে। আমেরিকা তার দাবিতে ছিল অনড়। লোকাল মুজাহিদিন লিডাররা ওসামা বিন লাদেনকে কোনভাবেই মুসলমানের শত্রু আমেরিকার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে। রাশান যুদ্ধে ওসামার অবদান তখনও তাদের স্মৃতিতে অম্লান। তাছাড়া ওসামার কারিশ্মাটিক ব্যক্তিত্ব এবং গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অনেকের পছন্দের ছিল। ধর্মীয় আবেগ দ্বারা প্রভাবিত সিদ্ধান্ত, কাবুলে মোল্লা ওমরের পতন ডেকে আনে।

যে আফগানিস্তান সোভিয়েতকে বিতাড়িত করে স্বাধীনতা পেয়েছিল বোরহানউদ্দিন রব্বানি, আহমেদ শাহ মাসুদ, মোল্লা ওমর, আর জালালুদ্দিন হক্কানিদের হাত ধরে, সেই স্বাধীনতা আবার মাত্র ১০ বছরের মাথায় ভূলুণ্ঠিত হল, এবারের আক্রমণকারীদের নাম আমেরিকা।

আমেরিকাও রাশিয়ানদের মত পাপেট পেল। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে কাবুলের মসনদে বসল হামিদ কারজাই। মোল্লা ওমর আর তালেবান দুর্গম এলাকায় সরে যেতে বাধ্য হল। শুরু হল তালেবানের অস্তিত্ব রক্ষার দীর্ঘ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের শুরুর দশকে তালেবান শুধু বন্ধু হারিয়েছে, দুর্বল হয়েছে। কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে তাদেরই হারিয়ে যাবার কথা ছিল। তবে পিকচার তখনও অনেকখানি বাকি ছিল।

উত্থান আর পতনের এক যুগ পার করে, বহু বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণ করে তালেবান টিকে গেল। বহু স্ট্রাটেজি, গেরিলা টেকনিক, ডিফেন্স ও ডিফেন্সিভ আক্রমণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল তালেবানের, আর

বাড়তে লাগলো গ্রামে গ্রামে জনপ্রিয়তা; যা এই দলটির মূল চালিকাশক্তি। ২০১৩ সালে যখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পাশ করে গেছে, সে সময় আরেক অমানিশার অন্ধকার নেমে এল তালেবানের ঘরে। ক্যারিশ্মাটিক, স্বল্পভাষী, তালেবানের অবিসংবাদিত নেতা মোল্লা ওমরের মৃত্যু দেখল তালেবান। কারণ ছিল স্বাভাবিক অসুস্থতা। এই মৃত্যু যেন সুপার পাওয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবার চেয়েও ভয়ংকর, ট্রুম্যানের পারমাণবিক বোমা, ওবামার ড্রোনের চেয়েও প্রাণঘাতী, কাবুলের মসনদ হারানোর শোকের চাইতেও মর্মান্তিক।

২য় বারের মত তালেবানকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামতে হল। অন্তর্কলহ বাড়তে লাগলো দলটির ভেতরে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিয়ে। মোল্লা মনসুরের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ সবচাইতে শক্তিশালী ছিল। মোল্লা ওমরের ছেলে মোল্লা ইয়াকুব ছিল তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে হক্কানি নেটওয়ার্কের জালালুদ্দিন বা তার ছেলে সিরাজউদ্দিন হক্কানির পজিশন জানতে পারিনি। তবে মোল্লা আখতার মনসুর শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব লাভ করে এবং মোল্লা ওমরের আমীরুল মু'মিনীন টাইটেল লাভ করে। তবে মোল্লা মনসুরের আমলে তালেবানের তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চোখে পড়েনি। অন্যদিকে ইরাকভিত্তিক আবু বকর আল বাগদাদির দায়েশ বা আইসিস, তাদের খোরাসান ভিত্তিক প্রোজেক্ট করে তালেবানকে আরও বিপদে ফেলে।

এদিকে কাবুল আছে আমেরিকার পুতুল সরকারের হাতে। এই সরকার জাতিসংঘ স্বীকৃত ও সৌদিবান্ধব হলেও আজ পর্যন্ত এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখবার জন্য আমেরিকার জেনারেল নিকোলসন তার দলবল নিয়ে আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেঁড়ে আছে। যা দেশটির সার্বভৌমত্বের সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন সময়ে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য ফেরানোর কথা থাকলেও, কাবুলের গণতান্ত্রিক সরকারের অনুরোধ আর তালেবানের ভয় আজও আমেরিকাকে ব্যস্ত করে রেখেছে।

মোল্লা মনসুরের মৃত্যু হয় আমেরিকার ড্রোনে। ২০১৬ সালে। মোল্লা মন্সুর তার মৃত্যুর অনেক আগেই ভবিষ্যত তালেবান কর্ণধার ঠিক করে রেখে যায়। আর এটি ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের এক বিশাল সফলতা। মনসুর, মোল্লা ওমরের ছেলে মোল্লা ইয়াকুব বা হক্কানির ছেলে সিরাজউদ্দিনকে প্রধান না বানিয়ে তাদের দুজনের চাইতেও প্রবীণ এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথার ধর্মগুরু, হাইবাতুল্লাহ আকুন্দজাদাকে আমীরুল মুমিনীন বানায়। মনসুরের মৃত্যুর পর তালেবান তাদের ২য় ও ৩য় গুরুত্বপূর্ণ পদে ইয়াকুব ও সিরাজের নাম ঘোষণা করে। অন্তর্কলহ মিটে যায়।

হাইবাতুল্লাহ আকুন্দজাদার নেতৃত্বে তালেবান শুধু ক্ষমতা দখল ছাড়াও তাদের অন্যন্যদিকেও সফলতা লাভ করতে থাকে। মোল্লা ওমরের সময় থেকেই, দখলকৃত এলাকায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা; মূলত একটা সরকার যা যা করে তার সবই করত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শক্তিশালী হওয়ায় আকুন্দজাদার সরকার এই দিকগুলোতে মন দিতে পারে। কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়াতে থাকে। কাতারে দূতাবাস স্থাপন করে।

এই বাড়তি জনপ্রিয়তা তালেবানকে আবারও, ১৭ বছর পর, ২০১৮ সালে, কাবুলের মসনদের এক যোগ্য দাবিদার করে তোলে।

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে তালেবান অল আউট অপারেশান শুরু করে এবং এই অপারেশনের চতুর্থ মাসে, বর্তমান আফগানিস্তানের অর্ধেকের বেশি এখন তালেবানের দখলে। প্রথম আলোর একটা আর্টিকেল অনুযায়ো আফগানিস্তানের প্রায় ৭০ ভাগ ডিস্ট্রিক্ট তালেবানের দখলে।

কাবুলের সরকার ২০০১ সাল থেকে শুরু করে যখনই তালেবান দ্বারা বিপদের আশংকা করেছে, তখনই আলোচনায় বসতে চেয়েছে। আবার যখনই তাদের আমেরিকার প্রভু ড্রোন আর গুলি মেরে তালেবান ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, তখনই আবার বিপরীত। তবে এখনকার মত বিপজ্জনক অবস্থায় তারা কখনোই ছিলনা। অন্যদিকে ট্রাম্প সরকার যেকোন মুহূর্তে সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কাবুলের মসনদ আমেরিকার পাপেটদের হাতে থাকবেনা এটা এখন নিশ্চিত। তাই আশ্রাফ গনির সরকার আলোচনার জন্য এখন প্রায় মরিয়া।

বিভিন্ন সরকার ও সরকারের গুণ গাওয়া উলামা সম্মেলন করে তারা তালেবানের মন গলানো প্রেশার করে টেবিলে বসাতে চাচ্ছে। অন্যদিকে আমেরিকাও তাদের ১৭ বছরের ব্যর্থতা ঢেকে একটা সম্মানজনক এক্সিট খুঁজছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, তালেবান স্পোকসম্যান জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ, আমেরিকার জেনারেল নিকোলসনের আলোচনার প্রস্তাব তেমন একটা পাত্তা দেয়নি। বরং আইসিস এবং তালেবানের যুদ্ধ নিয়ে নিকোলসনের অহেতুক মন্তব্য নিয়ে তাকে সামান্য পচানি দিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অচিরেই তালেবান কাবুলের মসনদে অধিষ্ঠিত হবে। দেখা যাক এবারের বিশ্লেষণ কতখানি বাস্তবসম্মত।

ক্রমঃ ১২ - মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদি

সোভিয়েত যুদ্ধের সেনাপতিদের মধ্যে এই নামটা সম্ভবত সবচাইতে দুর্ভাগা। মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদিকে আমাদের প্রায় কেউই চেনেন না। অথচ হেকমতিয়ার এবং রব্বানি এদের দুজন একসাথে মোহাম্মাদের নেতৃত্বে একদলে ছিল। যা হোক সেই আলোচনায় পরে আসছি। ওসামা বিন লাদেন, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম কিংবা মাসুদের আগেই এই নামটা আনলাম।

জন্ম ২০ এর দশকে। ধর্মপরায়ণ পরিবারে। আফগানিস্তানের মার্ক্সিস্টদের তত্ত্ব যখন থেকে জনপ্রিয় হতে থাকে, মোহাম্মাদ এই তত্ত্বের কুফল নিয়েও বলতে থাকে।

সম্ভবত ৬০ এর দশকে রাজা জহির শাহের আমলের পার্লামেন্টে একবার এই নিয়ে বাবরাক কার্মাল ও আনিহিতাদের সাথে বাকযুদ্ধ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং কার্মাল হস্পিটালাইজড হয়। এই পার্লামেন্টারি ডিবেটে আফগান মুসলিম স্কলারদের প্রতিনিধি ছিল মোহাম্মাদ। তাই ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে আফগান স্কলারদের প্রতিনিধিত্ব করাই তার পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে ধারণা দেয়।

১৯৭৩ এ দাউদ খান আসে আর '৭৮ এ আসে নূর মোহাম্মাদ তারাকি। মূলতঃ তারাকির আমল থেকেই ধর্মীয় ঘরানার মানুষ এবং আলেম সমাজের উপর অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে। তারাকি ছিল কট্টর কমিউনিস্ট। অত্যাচারের এক পর্যায়ে তারাকি সরকার, মোহাম্মাদ নবীর ভাইকে হত্যা করে। এই ঘটনায় মোহাম্মাদ পাকিস্তানে পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে উলামা ও ছাত্র সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে তারাকির কমিউনিস্ট রেজিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সময় গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ও বুরহানউদ্দিন রব্বানিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রব্বানি কিংবা হেকমতিয়ার তখন থেকেই মোহাম্মাদের চাইতে বেশি জনপ্রিয় ও বড় নেতা হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু তারা কেউ কারও আন্ডারে কাজ করতে আগ্রহী ছিলনা। অতঃপর সাদামাটা জীবন ও ধর্মীয় পন্ডিত মোহাম্মাদ নবীর নেতৃত্বে গঠিত হল 'হারাকাত ইনকিলাবি ইসলাম আফগানিস্তান' যা ছিল কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রথম Umbrella Organization।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হেকমতিয়ার এবং রব্বানি আলাদা হয়ে যায় এবং যথাক্রমে জমিয়ত ও হিযব নামে আলাদা সংগঠনের ব্যানারে যুদ্ধ করতে থাকে। মোহাম্মাদ নবী হারাকাতের আমীর হিসেবেই সোভিয়েত যুদ্ধে অংশ নেয় এবং পরে বিভিন্ন সময়ে এই নেতারাই বিভিন্ন এলায়েন্স তৈরি করে যুদ্ধের প্রয়োজনে। তালেবানের প্রথম জেনারেশনের অধিকাংশ নেতা (মোল্লা ওমরসহ) মোহাম্মাদ নবী

মোহাম্মাদির হারাকাত ইনকিলাবের ব্যানারে সোভিয়েত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মোহাম্মাদ নবীর সংগে বিদেশি রিক্রুটার ওসামা বিন লাদেন ও ট্রেইনার আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম সহ মুজাহিদিনদের অন্যান্য লিডারদের ভাল সম্পর্ক ছিল।

(সোভিয়েতের প্রস্থান ও) নাজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর, মাসুদ-রব্বানি-হেকমতিয়ার ও অন্যান্য মুজাহিদিন কোয়ালিশন সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোহাম্মাদ দায়িত্ব পালন করে। তবে যখন একটা গ্রুপ আরেকটা গ্রুপের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন হারাকাত ইনকিলাবের ব্যানারের লোকদের অস্ত্র ধরতে নিষেধ করে মোহাম্মাদ নবী। গৃহযুদ্ধের সময় কোন পক্ষ না নিয়ে, বিরোধ মেটাবার পক্ষে ছিলা হারকাতে ইনকিলাব।

১৯৯৬ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসলে তাদের সংগে ভালো সম্পর্ক ছিল মোহাম্মাদ নবীর। তবে ততদিনে বয়সের ভার তাকে কাবু করে ফেলেছে।

মৃত্যুঃ Natural Causes.

ক্রমঃ ১৩ - ISIS

Islamic State of Iraq and Sham

শাম বা বৃহত্তর সিরিয়াকে (অথবা মারমারের পশ্চিমে) ইংরেজিতে Levant বলে। তাই এর আরেক নাম ISIL. [আরবিতে একে আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়া ফি ইরাক ওয়া শাম অথবা সংক্ষেপে দা'ইশ বা দায়েশ বলা হয়]

আল কয়িদাতুল জিহাদ কিংবা তালেবানের জন্মের সঙ্গে ISIS এর শুধু একটা Thin Line ছাড়া সোভিয়েত যুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই। ISIS মূলত আল কায়েদা বা আল কয়িদাতুল জিহাদের সাথে একসময় বায়াতবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমি আসলে ISIS এর গুরু হিসেবে ওসামা বিন লাদেনকে মনে করিনা। আদর্শ ও ফিকাহ এর দিক থেকেও ISIS আল কায়েদা থেকে অনেক অনেক আলাদা।

ISIS এর জন্ম ইরাকে। এটার আদর্শিক গুরু বা গোড়াপত্তন করে এক জর্ডানিয়ান, শামের অধিবাসী, আবু মুসাব আল যারকাউয়ি। আমার এক বন্ধু একবার ঠাট্টা করে বলেছিল যে ইরাক থেকে জন্ম নেওয়া কোন কিছুই নাকি ভালো না। (অবশ্যই ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবী ও তাঁদের উম্মত ব্যতীত)

নাইন ইলেভেন যদি ওসামা বিন লাদেনের ভুল বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এরকম অজস্র ভুলের ভেতর ডুবে আছে দায়েশ। দায়েশের আফগানিস্তানের শাখার নাম Khorasan Province (KP)। আমি নিশ্চিত নই, তবে সম্ভবত এইটা আইসিসের উপমহাদেশীয় কন্ট্রোল প্যানেল ও AQIS এর কাউন্টার। এই ধারণা এজন্য করেছি যে এই ISIS খোরাসান প্রভিন্সের জন্ম দেওয়ার সময় বলেছিল যে তারা ইমাম মাহদিকে খোরাসান থেকে ছুটে এসে বায়াত দিতে চায়; এজন্যই আফগানে এসেছে।

কাজেই ভারতের গাযওয়াতুল হিন্দেও তাদের সাওয়াব নেওয়ার ফ্যান্টাসি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের জামায়েতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি টাইপের উগ্রবাদী সংগঠনের বায়াত আছে আইসিসের কাছে এমনও শোনা যায়।

২০১৫ সালে ISIS খোরাসান প্রভিন্সের জন্ম দেয়। তবে এর আগে তেহরিকি তালেবান পাকিস্তানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি।

তেহরিকি তালেবান পাকিস্তানের একটা সংগঠন, আফগান বর্ডারের দিকে এদের কার্যকলাপ বেশি। তেহরিকের টপ ম্যানেজমেন্ট দাবি করে তারা তালেবানের কাছে বায়াতবদ্ধ। এই সংগঠনের ব্যাপারে আমি এখানে এমন কিছু দাবী করতে চাই যেগুলো সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। কেন ধারণার বশবর্তী হয়ে বলছি তাও বলবার প্রয়োজন আছে।

আমি দাবী করি 'তেহরিকি তালেবান পাকিস্তান' মূল তালেবানের কোন অংশ নয়। বরং এরা বড়জোর একটা Franchise হতে পারে। তেহরিক মূলত আফগান তালেবানের একটা প্লেয়ার যা মূলতঃ নাইন ইলেভেনের পর পাকিস্তানে অপারেটিং প্রেশার গ্রুপ। এই গ্রুপকে তালেবান ব্যবহার করে আইএসআই তথা পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে নেগোসিয়েশনের জন্য। এই দাবির পেছনের ফ্যাক্টগুলো হল:

১.
তালেবান তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে। তাদের প্রাইমারি উদ্দেশ্য হল আফগান মানচিত্রে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্য মোল্লা ওমরের এক বিরাট রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ছিল। তালেবান প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা আফগানিস্তানের বাইরে গ্লোবাল খিলাফত প্রতিষ্ঠা তথা অন্য দেশের ভূমি নিয়ে মাথাব্যথা করেনা। শুধু এই একটা নীতি তালেবানের জন্য বৈদেশিক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় যা আল কায়েদা বা আইসিসের জন্য বন্ধ। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিশিষ্ট একটা সরকারের জন্য পাকিস্তানি শাখা থাকাটা মানায় না। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তেহরিকের ভূমিকা আসলে কোথায়?

২.
মোল্লা ওমর তার জীবদ্দশায় আল কায়েদা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছিল। অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব না বলে আলাদা স্বকীয়তা বললে ভালো হতো। ওসামা তার একান্ত বন্ধু ছিল বটে কিন্তু আল কায়েদা এবং তালেবানের মধ্যকার একটা স্পষ্ট গ্যাপ করে দুটোকে মিশে না যেতে দেওয়া ছিল মোল্লা ওমরের ট্যাক্টিক। নাইন ইলেভেনেও আমেরিকা সরাসরি তালেবানকে দায়ী না করে বলেছে, তালেবান ওসামার আশ্রয়দাতা ও বন্ধু।

তাই তেহরিকি তালেবানের (TTP) মত সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বজায় রাখা মোল্লা ওমরের নীতির সাথে যাবার কথা না। বরং TTP হল আল কায়েদার মতই বায়াতবদ্ধ সংগঠন, তালেবানের অংশ নয়, টিটিপির কাজের দায়ভার তালেবান বহন করেনা।

৩.
নাইন ইলেভেনের পর পাকিস্তানের সঙ্গে তালেবানের সম্পর্কের মাঝখানে ক্রমশই আমেরিকা ঢুকে পড়ে। আমেরিকাকে টপকে তালেবানকে সাহায্য করবার মত সাহস ISI অফিসারদের ছিলো না। তাছাড়া অনেক

অফিসার পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও ডলারের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় পাকিস্তানি আর্মি আসলে তালেবানদের সহযোগিতার বদলে কিছুই পাচ্ছিলনা। তাই তালেবান সম্ভবত টিটিপিকে দিয়ে পাকিস্তানি বর্ডার এলাকায় খবরদারি করিয়ে ISI এবং পাকিস্তানি সরকারকে প্রেশারে রাখার চেষ্টা করে।

তালেবান-পাকিস্তান সম্পর্কও একটা বিশাল টপিক। লাল মসজিদে হামলা ও রশীদ গাজীকে হত্যার মধ্যে দিয়ে এই সম্পর্কের কফিন বানিয়েছিল পাকিস্তান। আবার গাজীর ভাই আজিজকে কেন সব মামলায় নিরপরাধ সাজানো হয়েছিল সেও এক রহস্য।

ক্রমঃ ১৪

TTP বা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান একটা উগ্রপন্থী সংগঠন। ওলামাবিদ্বেষী পারভেজ মোশাররফ রেজিমের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড এই ধরণের সংগঠন তৈরির ট্রিগার হিসেবে কাজ করে।

আইসিস মূলত আফগানিস্তানে ঢুকবার চেষ্টা করে ২০১৪ সালে যখন সিরিয়া এবং ইরাকের একটা বেশ বড় অংশ তাদের দখলে। আগেই উল্লেখ করেছি যে আইসিসের টপ অফিসাররা বাস্তব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের চাইতে ফ্যান্টাসি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। সেইরকমই তাদের ফ্যান্টম স্টেটের তারা নাম দেয় খোরাসান প্রভিন্স।

টিটিপি আগে থেকেই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছিল। আফগান তালেবান বরাবরই পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক লাভবান হতে চায়। তাদের কর্মকাণ্ডকে তারা আফগানিস্তানের স্বীকৃত মানচিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখাতে চায়। তাই পাকিস্তানি মানচিত্রের ভেতরে নিজেদের কোন সংগঠন তারা প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেবেনা। এসব নিয়ে টিটিপির সাথে (যারা পাকিস্তানে এক্টিভ) আফগানি তালেবানের মনোমালিন্য ছিল। অন্যদিকে অপারেটিং ফিকহি দিক থেকেও টিটিপির টপের সংগে আফগান তালেবানের পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। ২০১৪ সালে পেশোয়ারে টিটিপি যে স্কুল হামলা চালায়, আফগান তালেবান তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করে।

২০১৩ সালে আফগান তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা, ক্যারিশ্মাটিক ব্যক্তিত্ব মোল্লা ওমরের বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর খবর বাইরে চাওর না হলেও, টিটিপি এবং আইসিসের টপ কমান্ড দুইই এই বিষয়টা জানতো। মোল্লা ওমরের পরে আফগান তালেবান কম করে হলেও দুই বা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ২০১৪ সালে। De Dacto Leader মোল্লা মনসুর তখনও অন্য গ্রুপগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন ও সংঘর্ষে লিপ্ত। এই সুযোগে আইসিস মনে করে তারা আফগানিস্তানে ঢুকে নতুন বিপ্লবের জন্ম দিতে পারবে এবং খোরাসানে তাদের একটা গ্রুপ থাকা International Recruiting সহজ করবে কেননা খোরাসান এবং মাহদীর হাদিসগুলো ব্যবহার করে তারা আরও ধর্মীয় ফ্যান্টাসিতে আসক্ত যুবসমাজকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

আইসিস টিটিপি এবং আফগান তালেবানের দুই একজন অসন্তুষ্ট অফিসারকে নিয়ে খোরাসানে তাদের যাত্রা আরম্ভ করে। আফগান পাকিস্তান সীমান্তে মূলত তাদের প্রথম দিককার কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল।

টিটিপির অফিসাররা খুব সহজেই আইসিস ট্যাকটিকালের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। তাদের ব্রুটালিটি, স্টাইল, স্টান্টবাজি আইসিস হাই কমান্ডকে সন্তুষ্ট করে যা কিনা আফগান তালেবানকে এতদিন অন্তত

প্রকাশ্যে অসন্তুষ্ট করত। আইসিসে যোগদান করা একদিক থেকে লাভজনকও ছিল। আফগানিস্তানেও আইসিস অনেক তালেবান লিডারকে আকৃষ্ট করবার পেছনের কারণ হল কয়েকটা।

১. মোল্লা ওমরের মৃত্যুর পর তালেবানের হাই কমাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। মনসুর ও ইয়াকুবের বিরোধ এমনকি তালেবান বিলুপ্ত বা বহুধা বিভক্ত হয়ে যাবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২. দীর্ঘ এক যুগের ক্লান্তি অনেক তালেবকে অধৈর্য করে তোলে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে, এই স্টেলমেটের কোন শেষ নেই।

৩. আইসিসের আকর্ষণীয় মিডিয়া এক্টিভিটি, গেজেট ও হাই টেক ব্যবহারের চাকচিক্য এবং অতি আত্মবিশ্বাস যুবকদেরকে তথাকথিত গ্লোবাল ইসলামী খেলাফতে অংশ নিতে আকৃষ্ট করে।

৪. আইসিসে যোগ দেওয়ার মানে, তাদের বিশ্বব্যাপী বিশাল অর্থনৈতিক চেইনের সাথী হওয়া। তালেবান কিংবা অন্যান্য লোকাল insurgent group এর সমান র‍্যাংকের অফিসারের চাইতে একজন আইসিস অফিসার প্রায় ৫ থেকে এমনকি ১০ গুণ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পেত।

আইসিস মূলত আফগানিস্তানে অপারেট করেছে বা করছে আউটসাইডার হিসেবে। আফগানি মানুষের আফগান এথনিসিটির সাথে মিশে গিয়ে নয়। তাছাড়া দীর্ঘ দুই যুগ ধরে আফগানিস্তানের মানুষ তালেবানের সঙ্গে পরিচিত। এমনকি বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় তালেবানের কিছু উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে সমালোচিত হলে কেন্দ্রীয় তালেবান এদেরকে সতর্ক করতে এবং এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া আইসিসের মিশন এবং অপারেশন স্টাইল, অতি সন্দেহ এবং যেকোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক দ্রুত কঠোর সিদ্ধান্ত বর্তমান পৃথিবীর যেকোন শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য এক আতংকের নাম। আইসিস নামটা কাফের মুশরিকদের এক জ্বলন্ত আতংকের নাম সন্দেহ নেই। কিন্তু আইসিস নামটা মুসলমানদের অন্তরে ভীতির উদ্রেক করে নাকি স্বস্তি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আইসিসের হাই কমান্ড বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে এবং বিভিন্ন কাউন্টার স্ট্রাটেজি অবলম্বন করে অফেন্সিভ স্টাইলে প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে পারেনি।

আইসিস ইরাক ও সিরিয়ায় যে ধরণের স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে তা হল অল আউট অফেন্স। আইসিস অন্য যেকোন গ্রুপের সাথে সন্ধি বা চুক্তির তোয়াক্কা করেনা এবং তাদের বায়াত দিতে অস্বীকারকারী যেকোন গ্রুপকে তারা অনৈসলামিক দাবি করে যুদ্ধ করে এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। এই স্ট্রাটেজি আফগানিস্তানে পরিবর্তন না করবার মটো নিয়েই তারা প্রবেশ করে এবং তা থেকে অচিরেই বুঝতে পারে তাদের মূল শত্রু হল তালেবান। কেননা দীর্ঘমেয়াদে আশ্রাফ গনি বা হামিদ কারজাইয়ের সরকারকে অনৈসলামিক ঘোষণা করে তারা টিকে থাকতে পারবে এবং ধর্মীয় Credibility অর্জন করতে পারবে কিন্তু তালেবানের সাথে

তাকফিরের তকমা লাগিয়ে পেরে ওঠা কঠিন। আইসিস ২০১৪ সালে তালেবানের ভাঙনকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল কিন্তু তা করতে তারা স্বল্পমেয়াদে সফল হলেও দীর্ঘমেয়াদে ব্যর্থ হয়।

২০১৪ সালে মোল্লা মনসুর আইসিস হাই কমাণ্ডকে চিঠি পাঠায় যে আফগানিস্তানে ইসলামিক মুভমেন্টের মূল উদ্দেশ্য আমেরিকা ও পশ্চিমের সৈন্যবাহিনীকে তাদের পুতুল সরকার সহ উৎখাত করা। এই লক্ষ্যে যেকোন ইসলামী শাসনপ্রিয় লোককে তালেবানের অধীনে এই লড়াই চালানো উচিত। এই চিঠি থেকে বাগদাদির বুঝতে পারা উচিত ছিল (এবং তার কাছে মোল্লা ওমরের মৃত্যুর খবর ছিল) যে মোল্লা ওমর মারা গেছে। এ সময় তালেবানের ভাঙনকে কাজে লাগাবার জন্য বাগদাদি যদি শুধু মোল্লা মনসুরকে সমালোচনা করত তাহলে হয়তো দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে পারতো। কিন্তু বাগদাদি সরাসরি তালেবানের অবিসংবাদিত নেতা মোল্লা ওমরের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে সমালোচনা করে আফগানিস্তানের বহু সিনিয়র ধর্মীয় নেতার মন ভেঙে দেয়। আইসিস নিচের তিন ধরণের ব্যক্তির জন্য একই ধরণের পাশবিক কায়দা অবলম্বন করে এবং তিনজনের ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরণের ট্রিটমেন্ট হাতে নেয়ঃ

১. একজন ন্যাটো অফিসার যে আফগানিস্তানে অপারেট করছে
২. কাবুল সরকারের প্রতিনিধি অফিসার
৩. তালেবান

মুসলমান হত্যার ক্ষেত্রে আইসিস কোন মায়া মমতা অথবা বাধ্য হয়ে হত্যা করছি এমন নাটক পর্যন্ত করেনা। ল্যান্ড মাইনের উপর তারা মুসলমানদের বসিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই নৃশংস হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে টেরর এক্সেরসাইজ করে।

মোল্লা মনসুরের মৃত্যুর পর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তালেবান নিজেদের গুছিয়ে ফেলে এবং ফলশ্রুতিতে মিলিটারি মাইট ও আদর্শে আইসিসকে কচুকাটা করে তাদেরকে আফগানিস্তানে কোণঠাসা করে ফেলে। ইরাক ও সিরিয়া থেকে বিতাড়িত বহু আইসিস সৈন্য এখন ইরান ও অন্যান্য পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আফগানিস্তানের প্রবেশ করছে। তবে এই নতুন সংখ্যাও আইসিসকে দীর্ঘমেয়াদে তেমন কোন সাফল্য এনে দেবে বলে মনে হয়না। কেননা আইসিসের পরাজয় কেবল রাজনৈতিক বা মিলিটারি পরাজয় নয়, সম্ভবত আদর্শিকভাবেও তাদের পতন হয়েছে; খুব কম করে হলেও।

আফগানিস্তানের ভবিষ্যত ও আইসিস

সিনারিও ১ - বর্তমান ধরণের সরকার কাবুলে এবং তালেবান কাবুল সরকারের প্রধান হুমকি

এই অবস্থা আইসিসের ভবিষ্যতের জন্য সবচাইতে খারাপ। পশ্চিমা ফান্ডিং এর একটা অংশ পাচ্ছে কাবুল। আবার মধ্যপ্রাচ্যের গোষ্ঠীগুলো থেকে যে ফান্ডিং তার অংশও পুরোটা পাচ্ছেনা। পাকিস্তান আইসিসকে বিশ্বাস করেনা। সব মিলিয়ে ত্রিপাক্ষিক জটিলতায় আইসিস ব্যবহৃত হওয়া ছিবড়ে শক্তি হিসেবে কতদিন চালিয়ে নিতে পারবে সেটাই বলা কঠিন। তবে আফগান দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হয়তো আইসিসকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবে।

সিনারিও ২ - তালেবান সরকার

ভবিষ্যতে তালেবান যদি কাবুলের আমেরিকান শক্তিকে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে আইসিস টিকে থাকার বা প্রভাব বিস্তারের একটা চ্যালেঞ্জিং সুযোগ পাবে। পশ্চিমা অর্থায়ন মূলত সেক্যুলার শক্তিকে ছেড়ে দিয়ে আইসিসে বিনিয়োগ করবে এবং পাকিস্তান হয়তো নেগোসিয়েশন পাওয়ার হিসেবে আইসিসকে প্রক্সি হিসেবে নিতেও পারে। তবে আইসিসকে পাকিস্তান কতটা বিশ্বাস করবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার।

সিনারিও ৩ - তালেবান শেষ পর্যন্ত গনি বা অনুরুপ শক্তির সঙ্গে Power Sharing Agreement এ যাবে এবং কাবুলে কোয়ালিশন সরকার থাকবে আমেরিকার প্রস্থানের পর

এটা আইসিসের সবচাইতে ফেভারিট অবস্থা। কারণ কোয়ালিশন সরকার আদৌ বেশিদিন টিকবেনা। এবং আবারো আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধের দিকে যাবে হয়তো। তখন বিদেশী ফান্ডিং বা দেশীয় বড় শক্তির কাছে এরা দাম পাবে। তাছাড়া কাবুল সরকারের সাথে শেয়ারিং, গ্রামে তালেবানের ধর্মীয় পরায়ণতা প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে এমনকি তা তালেবান ভাঙনের কারণও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের একমাত্র সঠিক ইসলামের প্রতিনিধি দাবি করে আইসিস এগিয়ে যেতে পারে।

ক্রমঃ ১৫

ক্রমশই পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে আর তাই হওয়ার ছিল হয়তো। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রায় চারটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলোকে আমার ভাবনাগুলোকে একত্রিত করতেই লিখতে বসলাম আবার। লেখার কলেবরের কারণে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলাম।

কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ে একাধিক মত থাকা অস্বাভাবিক নয়, বরং এটাই স্বাভাবিক। জামায়াতের প্রয়াত নেতা কামরুজ্জামান যেমন দলকে আপাদমস্তক বদলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার এই সংস্কারের সুবুদ্ধিকে নিজামি ও মিসেস নিজামি প্রত্যাখ্যান করেছিল কঠোর ভাষায়। যদিও তারা সবাই জামায়াতের একনিষ্ঠ কর্মী।

১৭ বছরের স্ট্রাগল অনেক বুড়ো ঘোড়াকেও কিছুটা ক্লান্ত করে ফেলে। তড়িঘড়ি একটা সমাধান হলেও তারা একটা শেষ দেখতে চায়। অনেক তরুণ তুর্কি চায় রাষ্ট্র ক্ষমতা আস্বাদন করতে, সর্বজনস্বীকৃত প্রশাসনের অংশ হয়ে শাসন করতে; যা অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রাগলে পানি ঢেলে দেয়।

জুলিয়াস কায়সার [সিজার] রোমের ইতিহাস বদলে দেওয়া প্রথম সম্রাট। কিন্তু কায়সার তার জীবনের এক যুদ্ধে রোমান অভিজাতদের প্রতিনিধি পম্পের কাছে হারতে বসেছিলেন। ইতিহাসের একটা বয়ান ছিল এমনঃ

> **পম্পে কায়সারের সমস্ত বাহিনিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে। খাদ্য ও পানির সাপ্লাই লাইন থেকে বঞ্চিত কায়সার বাহিনি অল্প কয়েকদিনেই আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যুকে বেছে নিত। কিন্তু বাঁধ সাধলো লোভি রোমান এরিস্ট্রোক্যাটদের একটা দল। তারা পম্পেকে তার মতের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে বাধ্য করে। কয়েকটা ফ্রন্টে পম্পের জয় তাদেরকে মোহগ্রস্থ করে ফেলে। যদিও পম্পে পুরনো বন্ধু হিসেবে কায়সারের মিলটারি ট্যালেন্ট সম্পর্কে জানতো তারপরেও সে পরাজিত হয়েছিল। রোমের ইতিহাস লিখবার দায়িত্ব পেয়েছিলেন রোমের প্রথম সম্রাট জুলিয়াস সিজার।**

১৭ বছর আগে ২০০১ সালে আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে।

এই আক্রমণের বাহ্যিক কারণ হিসেবে তারা দেখায় যে, তালেবান নিজে সন্ত্রাসী হোক বা না হোক তারা সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়েদা ও বিভিন্ন জংগি নেতাকে আফগান মানচিত্রে অবাধ বিস্তারের সুযোগ দিচ্ছে। এই গোষ্ঠীগুলো বিশ্ব-শান্তির জন্য হুমকি। সুতরাং শান্তিকমিটির প্রধান হিসেবে আমেরিকা তালেবান

সরকারকে উৎখাত করতে আফগানিস্তান আক্রমণ করে। আমেরিকা ধারণা করেছিল তারা দুই বা বড়জোর চার-পাঁচ বছরের মধ্যে হামিদ কারজাই এর মত পুতুল বসিয়ে ছড়ি ঘুরাতে পারবে।

এই উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করলে দেখা যায় ১৭ বছরের এই যুদ্ধে আমেরিকা আসলে পরাজিতই হয়েছে। হ্যাঁ, একথা সত্যি যে মিলিটারি মাইটে তালেবান আমেরিকার সমকক্ষ নয়, এমনকি আশেপাশেও নেই। কিন্তু গত ১৭ বছরে আমেরিকা তার মুসলমান বা অমুসলমান নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে আফগান তালেবান ও মুসলিম হত্যায়।

আজ ১৭ বছর পর আজ আমেরিকা কাতারে গিয়ে সেখানকার তালেবান এজেন্সিতে যখন আলোচনার জন্য তালেবানকে ইসলামি এমিরেটস বা আফগানিস্তানের সমান্তরাল সরকার হিসেবেও মেনে নিচ্ছে, তখন এই বিলিয়ন ডলার এবং নিহত আমেরিকা ও ন্যাটোর হাজার নিহত সৈনিকের পরিবারের কাছে কী জবাব দেবে তারা? ১৭ বছর পর আফগানিস্তানের ম্যাপ বা টেরিটরির দখল নিয়ে যদি নেগোসিয়েশনে বসবেই তারা তাহলে তালেবানের সাথে এত রক্তক্ষয়ের কী মানে হল।

আমরা সবাই জানি এবং মেনেও নিয়েছি যে মুসলমানের রক্ত কম দামী। কিন্তু এতগুলো ইউরোপিয়ান আর্মির রক্ত দিয়ে, আমেরিকান ইকোনমিকে ধ্বংসের মুখোমুখি করা বিলিয়ন ডলারের ব্যয় করে মোল্লা ওমরের ছেলের কাছে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করাই হয়, তাহলে মোল্লা ওমরের কী দোষ ছিল?

মোল্লা ওমরের সময় আল কায়েদা বা অনুরূপ সংগঠনগুলোর সঙ্গে তালেবানদের যে সম্পর্ক ছিল তার কার্যত তেমন পরিবর্তন হয়নি যে তা আমেরিকাকে সুখ দেবে কিংবা আমেরিকা বলতে পারবে যে তালেবান সন্ত্রাসী সঙ্গ ত্যাগ করায় তারা আলোচনায় বসেছে।

তালেবানের এক নম্বর হিবাতুল্লাহ আকুন্দজাদা। দুই নম্বর কে?

মিলটারি কমান্ডারদের এক নম্বর হল সদ্য প্রয়াত জালালউদ্দিন হক্কানির ছেলে সিরাজ। সিরাজের সঙ্গে আল কায়েদা এবং পাকিস্তানি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এমনকি তালেবানের ক্রাউন প্রিন্স বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয়না।

সাম্প্রতিকঃ খলিলজাদ, এরিক প্রিন্স, আব্দুল গনি বারাদার ও জেনারেল মিলার

আমেরিকার কূটনৈতিক বুদ্ধির জাতটাই হল প্রতারণা দিয়ে ভরা। তারা সব কূল রক্ষা করেই আগাতে চায়। সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগ পর্যন্ত সবদিকেই নিজেদের এগিয়ে নিতে

চায়। মজার ব্যাপার হল তালেবান আমেরিকার এই চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই কাতারের এম্ব্যাসির খলিলজাদ কিন্তু কান্দাহারে জেনারেল মিলারের জীবন বাঁচাতে পারেনি।

বাংলাদেশে আওয়ামীলীগকে কেন আমি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল বলি তার কারণ হল, রাজনৈতিক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো এখনো এই সবকূল রাখবার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারেনি।

জালমে খলিলজাদ হল আমেরিকার নেগোশিয়েটর। ভদ্র লেবাসে আমেরিকা তাকে কাতারে পাঠিয়েছে তালেবানের এম্ব্যাসিতে গিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য। খলিলজাদের জন্ম আফগানে। সে আফগান, পাকিস্তান এবং আশা করা যায় দুরন্দ লাইনের সীমান্ত এবং জাতিগোষ্ঠীগুলোকে চেনে। ২০২০ সালে ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতা হারাবার আগেই একটা সম্মানজনক নেগোসিয়েশন করা যায় কিনা তার জন্যই আমেরিকা তাকে নিয়োগ দিয়েছে।

কিন্তু নেগোসিয়েশন টেবিলে নিজেদের এগিয়ে রাখার জন্য আমেরিকা আরও একজন প্লেয়ারকে সাইড বেঞ্চে জার্সি পরিয়ে বসিয়ে রেখেছে; এরিক প্রিন্স। এই নামটিকে সারা বিশ্বের লোক ভয় পায়। এরিক আমেরিকান আর্মির প্রাক্তন লোক। আর্মির ভয়ংকর, দুর্ধর্ষ, নিয়ম নীতি ও মানবতার ধার না ধারা লোকেদের (যাদের কেউ কেউ আর্মি থেকে বাদ পড়ে ড্রাগ ও ডিসিপ্লিন ভঙ্গের কারণে) নিয়ে প্রাইভেট আর্মি গঠন করেছে। এই আর্মি বিভিন্ন জায়গায় ইউএস আর্মির প্রক্সি দেয় এবং এরা নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানোর এক্সপার্ট। এদের নিয়োগে আমেরিকার বাজেট বছরে কম লাগে। আমেরিকার আর্মির আর যাই হোক বিশ্বব্যাপি ভাবমূর্তির একটা নূন্যতম বালাই আছে যদিও আমরা জানি এরা সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্ট। তবু এরিক প্রিন্সের সেই বালাই নেই। প্রাতিষ্ঠানিক লাভের খাতিরে আফগানিস্তানের মানুষের জান ও মাল এরিকের জুতোর ময়লার মত। তাই তালেবান এমনকি গনি কিংবা সালাউদ্দিন রব্বানির জমিয়ত কেউই এরিকের আনাগোনা পছন্দ করছেনা। কিন্তু আমার জানামতে এরিক এখনও কাবুলে এবং সে ট্রাম্পকে প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছে আফগানিস্তানের দায়িত্ব তার হাতে দিতে।

এটা ট্রাম্প প্রশাসনের প্ল্যান বি। হেরে বিদায় নেওয়ার আগে প্রতিনিধি রাখলে আবোল তাবোল বলে পার পাওয়া যাবে। সমস্যা হল এরিক প্রিন্সের বৈশ্বিক কসাই ইমেজ। ন্যাটোর অন্যান্য সদস্যকে ম্যানেজ করা একটা চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী আরেকবার নিন্দিত হতে হতে পারে এরিকের অপকর্মের জন্য।

শেষ পর্যন্ত এরিক দায়িত্ব পাক বা না পাক, তাকে জার্সি পরিয়ে বসিয়ে রাখলে আলোচনার টেবিলে খলিলজাদ কিছুটা আক্রমণে যেতে পারবে।

তালেবান বেশ চতুরতার সাথে আমেরিকার আক্রমণের জবাব দিচ্ছে। গজনীর প্রাদেশিক রাজধানী দখল তালেবানের স্ট্রাটেজিক আক্রমণের একটি। এই আক্রমণের প্রকৃতি দেখে মনে হয়েছে এটাও আমেরিকাকে শক্তি প্রদর্শনের মহড়া ছিল, গজনী দখল করে রাখার উদ্দেশ্য ছিলনা। তালেবান দেখিয়ে দেয় যে তাদের শক্তি আছে প্রাদেশিক রাজধানী দখল করবার। এই সবই আলোচনার টেবিলে তালেবানকে ভবিষ্যতে এগিয়ে রাখবে আর ট্রাম্প প্রশাসনকে ব্যস্ত করবে আলোচনায় আসতে।

সম্প্রতি আমেরিকান জেনারেল মিলারকে আক্রমণ করাও ছিল এর কাছাকাছি কিছু। আমরা নিশ্চিত নই যে মিলারকে হত্যা করা আদৌ তালেবানের উদ্দেশ্য ছিল কিনা (এতটা দুঃসাহসে ক্র্যাকডাউনের ভয় আছে কেননা মিলিটারি মাইটে তালেবান পুরো আমেরিকার কাছে কিছুই না) তবে তালেবান দেখিয়ে দিয়েছে ১৭ বছরের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গনির লোকেদের মাঝখান থেকেই তারা আম্রিকার জেনারেলকে হত্যা করবার মত ক্ষমতা রাখে।

তালেবান হত্যা করে আব্দুর রাজিককে। রাজিক ছিল কান্দাহার প্রদেশের সিকিউরিটি চীফ। এই ঘটনায় কান্দাহারে পার্লামেন্ট নির্বাচন পিছিয়ে গেছে। রাজিক ছিল তালেবান বিরোধি কিংবদন্তি জেনারেল।

সম্প্রতি শেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল পাকিস্তানের কারাগার থেকে মোল্লা ব্রাদারের (মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার) মুক্তি। মোল্লা ব্রাদার হলো মোল্লা ওমরের সময়কার নেতা এবং (বয়সে ছোট হলেও) বর্তমান নেতা আকুন্দজাদার সিনিয়র বলা যেতে পারে। বর্তমানে তালেবানের ক্ষমতা তাদের সেকেন্ড জেনারেশন নেতা মোল্লা ইয়াকুব বা সিরাজ হক্কানির উপর আছে। কিন্তু মোল্লা ব্রাদার প্রথম জেনারেশনের নেতা। যদিও আফগান তালেবান এ ঘটনাকে দৈব বলে স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু এই কথাটা কতটুকু বিশ্বাস করা যায়? এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পাকিস্তান ইরান এমনকি রাশিয়াও বসে নেই। সেইসময় মোল্লা ব্রাদারকে একেবার বিনা নেগোসিয়েশনে বিনা কারণে পাকিস্তান মুক্তি দিল?

এই ঘটনার অনেকগুলো ব্যখ্যা হতে পারে তবে তালেবানের জন্য সবচাইতে সুখকর হল প্রেসিডেন্ট ইমরান খানের বদান্যতা। সন্দেহ নেই ইমরান সমস্ত ঘটনাকে তাঁর নিজের মস্তিস্ক দিয়ে বিচার করবার বিচক্ষণতা রাখেন। এবং এর আগেও ইমরান ও তার দল তেহরিক ইনসাফ ইসলামি দলগুলোর সাথে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন।

তবে পাকিস্তান আর্মি এই খেলায় নীরব বসে থাকতে চায়না। আমেরিকা তার বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে তালেবানকে দ্রুত মীমাংসায় আনতে চাচ্ছে। আশংকা আছে যে মোল্লা ব্রাদার হয়তো তালেবানের ভিতরের সেই দলের মতকে প্রাধান্য দিতে পারে যারা চায় একটা কোনরকম প্রাপ্তির সরকার তৈরি করে আমেরিকাকে খুশিমনে বিদায় দিয়ে পরে আস্তে আস্তে পুরো আফগান দখল করবে। এরকম হলে

তালেবানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কিছুটা দুর্বলতার সৃষ্টি হতে পারে, যা খলিলজাদের সামনে তালেবানকে কিছুটা shaky করবে।

এপ্রিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তালেবান আরও বড় কোন শক্তির প্রদর্শনী করবে সন্দেহ নেই। হতে পারে তা কোন এক পদপ্রার্থীর জীবন। আশরাফ গনি?

তবে এই দৃশ্যপটে একজন পুরনো প্লেয়ারের আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত থাকুন যেকোন দিন।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। সোভিয়েত যুদ্ধের সেনানী।

ক্রমঃ ১৬

তালেবান সম্পর্কে প্রথম শুনি অনেক আগে। সেক্যুলার জীবনে। তবে ইসলামে আসবার পরে কিছু ইসলামী ভাইদের কাছ থেকে মোল্লা ওমর এবং তালেবান সম্পর্কে মাদক চাষের কারবারের কথা শুনতে পাই। এই সিরিজে এর সত্যতা অনুসন্ধান করে কী পেলাম তা না বললেই নয়।

পপি ফুল চাষের জন্য আফগানিস্তান বিখ্যাত। এই ফুল আফগান বৈদেশিক আয়ের এখনও একটা বড় অংশ অবদান রাখে। পপির নির্যাস থেকে মরফিন, হেরোইনের মত প্রাণঘাতী মাদক তৈরি হয়।

সোভিয়েত যুদ্ধের সময় এবং তারপরেও পপি চাষ আফগানিস্তানে ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন দেশ উপকারি ওষুধ এবং তেল তৈরির জন্য স্বল্প মাত্রায় এর চাষ করে থাকে। কিন্তু আফগানিস্তানে ছিল এসবের বালাই ছাড়াই মাদক চাষের রাজত্ব। এখানে লাইসেন্সবিহীনভাবে দেদারসে পপি চাষ করে তা ইউরোপের মার্কেটে বিক্রি করা হত।

গ্রাহাম ফ্যারেল এবং জন থর্ন নামক দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের জার্নাল পড়ছিলাম। এদের একজন ইউকে আরেকজন আমেরিকার। তারা উল্লেখ করেন যে, মোল্লা ওমর ২০০০ সালে পপি চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এবং তারা আরও উল্লেখ করেন যে, তালেবান সরকার এই ব্যান শুধু কাগজে করেই ক্ষান্ত দেয়নি বরং তারা তালেবান অধ্যুষিত এলাকায় ৯৯% ক্ষেত্রে পপি চাষ বন্ধ করেছে।

এই দুই স্কলার আরও উল্লেখ করেছেন, ২০০২ সালে পপির চাষ আরও বেড়ে যায় এ কারণেই যে ২০০১ এর ডিসেম্বরে তালেবানের পতন হয়।

এই সমস্ত কথার পর তারা নিজেদের ডিফেন্ডও করেছেন যে তালেবানের এই বিষয়ে গুণগান গাওয়ার অর্থ তাদের সরকারকে সমর্থন করা নয়।

সম্প্রতি তালেবান তাদের মস্কো সামিটে পপি চাষের ব্যাপারে আমেরিকাকে কন্ডেম করেছে যে আমেরিকা ও তার পুতুল সরকার আফগানের ভূমিতে মাদক চাষকে না কমিয়ে আরও বাড়তেই দিচ্ছে।

আমাদের অধিকাংশ লোকের কাজ হল কোন ব্যাপারে না জেনে আত্মবিশ্বাসের সাথে মন্তব্য করা। আচ্ছা এমন কি একেবারেই অসম্ভব যে অবৈধ মাদক সম্রাটেরা আমেরিকাকে তালেবান হঠাতে একটা কী প্লেয়ার হিসেবে ইন্ধন দিয়েছিল? পৃথিবীর সবই ব্যবসা। কেউ দুনিয়ার দোকানদার, কেউ... ... ...

ক্রমঃ ১৭

সম্ভবত এটাই আমাদের অতীত নিয়ে শেষ পোস্ট। সোভিয়েত যুদ্ধের সেনানী হিসেবে আমরা সংক্ষেপে ওসামা, ইউসুফ আযযাম এবং মোহাম্মাদিকে নিয়ে আলোচনা করেছি।

বোরহানউদ্দিন রব্বানি, মাসুদ কিংবা ওসামাকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছিনা সঙ্গত কারণেই। হেকমতিয়ারকে আলোচনা করবার কারণ হল, আমাদের এই সিরিজের অতীত ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যক্তি গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের অতিপ্রাসঙ্গিকতা। এবং আমরা ধারণা রাখি, অদূর ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে হেকমতিয়ার অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করবে। তবে একথা অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আহমেদ শাহ মাসুদের পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের প্রতি দুর্বলতার কারণেই তার অনেক গুরুতর অপরাধ আমাদের বেনিফিট অফ ডাউট দিতে প্রলুব্ধ করে। মাসুদকে নিয়ে বেশি কথা না বলবার এটা আরেকটা কারণ।

আজ আমরা ফিরে যাবো সেই সত্তরের দশকে, কাবুল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের এক ঐতিহাসিক সময়ে। যখন বোরহানউদ্দিন রব্বানি পিএইচডি শেষ করে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। মিশরের ব্রাদারহুড দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গঠন করেছেন নিজস্ব দল; জমিয়াত-ই-ইসলামী আফগানিস্তান।

গঠিত হবার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বোরহান আফগানিস্তানের এক সূর্য সন্তানকে তার একান্ত শিষ্য হিসেবে পেয়েছিলেন। And what a follower he got! আহমেদ শাহ মাসুদ। তরুণ, উদ্যমী, সাহসী, ইসলামকে ভালোবাসে এমন একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। মাসুদের মত যোগ্য কিন্তু অনুগামী শিষ্য সম্ভবত এক সহস্রাব্দে একজন পাওয়া যায়। মাসুদের সঙ্গেই প্রায় সমসাময়িক রাগী, মাথা গরম কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী আরেকজন ফলোয়ার পেলেন বোরহান। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার।

বোরহানউদ্দিন রব্বানির এই দুই ফলোয়ার, পরবর্তীতে আফগানিস্তানের ইতিহাস বদলে দেবে। জনপ্রিয়তা, দক্ষতা এবং কৌশলে স্বয়ং বোরহানকেই ছাড়িয়ে যাবে।

খুব অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার জমিয়াত-ই-ইসলামী ত্যাগ করে গঠন করে তার নিজস্ব পার্টি হিজব-ই-ইসলামী। অন্যদিকে মাসুদ তার গুরুর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে তার পার্থিব জীবন অতিবাহিত করে। দূরদর্শী গুলবুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই মাসুদকে তার এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়, অন্তত ইতিহাসের এক বর্ণনায়।

আহমেদ শাহ মাসুদ, পাঞ্জেশির উপত্যকার সিংহপুরুষ, জমিয়তের দুই নম্বর হলেও মিলিটারি জেনারেল হিসেবে বোরহানউদ্দিন রব্বানিকে হাজারবার হারিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো।

মাসুদ এবং গুলবুদ্দিনের ইতিহাস সোভিয়েত বিরোধী মুজাহিদিনদের সবচাইতে বড় দুইটা ফ্র্যাকশনের ইতিহাস। এই দুইজন তাদের জীবনের প্রারম্ভিক সময় থেকেই আলাদা ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারি।

গুলবুদ্দিনকে পশ্চিমা বিশ্ব চেনে তার হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের কারণে। গুলবুদ্দিনের পলিটিকাল ইতিহাস হল একই আদর্শের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সন্ধির ইতিহাস। অন্যদিকে মাসুদ তার রাজনৈতিক জীবনে যতটা সম্ভব আদর্শের রাজনীতি করেছে। তার জীবনের পরতে পরতে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগের গল্প দিয়ে ভরা। মাসুদের আদর্শ ছিল ইসলামিক গণতন্ত্র। অন্যদিকে গুলবুদ্দিন অপেক্ষাকৃত মৌলবাদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল। স্বভাবতই গুলবুদ্দিন ছিল সৌদি প্রিন্স ও আফগান যুদ্ধের ফান্ড ওসামা বিন লাদেনের প্রিয়পাত্র, অন্তত তালেবান উত্থানের আগ পর্যন্ত।

নাজিবুল্লার কমিউনিস্ট সরকারের পতনের ঠিক আগে মাসুদ কাবুলকে ঘিরে ফেলে। ততদিনে সোভিয়েত রাশিয়ার শেষ সৈন্যও আফগানের মাটির মায়া ত্যাগ করেছে। নাজিব মাসুদের কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু মাসুদ তার আদর্শগত কারণে কাবুলে মার্চ করা থেকে বিরত থাকে।

মাসুদের নীতি ছিল, যেহেতু বহু মুজাহিদ বাহিনি যুদ্ধ করে রাশিয়াকে তাড়িয়েছে, তাই তাদের সবার অধিকার আছে শাসন ক্ষমতায় যাবার। পেশোয়ারে মুজাহিদ নেতাদের সম্মেলনে যোগ দেয় মাসুদ। সেখান থেকে দুটো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবনা আসে। দ্বিতীয়টায় বোরহানউদ্দিন রব্বানিকে প্রেসিডেন্ট (এক নম্বর ক্ষমতাধর) এবং গুলবুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। মাসুদ পায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদি (যার আন্ডারে মোল্লা ওমর সোভিয়েত যুদ্ধে অংশ নেয়) পায় বিচার বিভাগ। হেকমতিয়ার এই সম্মেলনে যায় না, ওসামা বিন লাদেনের অনুরোধ সত্ত্বেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম এর বেশ আগেই মৃত্যুবরণ করে।

মাসুদ এবং ওলামার অনুরোধ উপেক্ষা করে, হেকমতিয়ার কাবুলের দিকে মার্চ করে। তার বিশ্বাস ছিল আফগানিস্তানে কোন কোয়ালিশন সরকার টিকবেনা কারণ তা হবে দুর্বল। যদিও ইতিহাসের পরিক্রমায় আজ হেকমতিয়ারের মতামত সঠিক ছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু এই ঘটনায় তার চরিত্রের ক্ষমতাগ্রাসী দিকটা ফুটে ওঠে। কেননা এ কথাও সত্যি যে হেকমতিয়ার নিজেও কোন শক্তিশালী সরকার গঠন করতে সক্ষম ছিলনা।

আদর্শের দিক থেকে হেকমতিয়ার ছিল বেশ গরীব ও দুর্বল। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সে সোভিয়েত যুদ্ধের সময় থেকেই নানান মুজাহিদিন গ্রুপের সাথে পাওয়ার স্ট্রাগলে লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ আছে। এই অভিযোগ অত্যন্ত সত্যি বলে মনে হয় যখন হেকমতিয়ার কমিউনিস্টদের একটা ফ্র্যাকশনকে সাথে নিয়ে নাজিবুল্লাহকে হটানোর জন্য ১৯৯২ সালের এপ্রিলে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পেশোয়ার সম্মেলনের

সরকার মাসুদকে হেকমতিয়ারকে দমন করবার জন্য বলে, যেহেতু সে ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই হেকমতিয়ার পরাজিত হয়।

কিছুদিন আগে যেই হেকমতিয়ার দুর্বল কোয়ালিশন সরকারের বিরোধী ছিল, সেই পরাজিত হেকমতিয়ারই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে এবং শর্ত দেয় মাসুদকে সরে যাওয়ার। হেকমতিয়ার, রব্বানি এবং শিবগাতুল্লা মোজাদ্দেদির মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। হেকমতিয়ার কাবুল ত্যাগ করে আবারও মাসুদ-রব্বানির সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। আফগানিস্তান নিমজ্জিত হয় এক দুর্বল পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোয়ালিশন সরকারের অধীনে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে। মোহাম্মাদ নবি মোহাম্মাদির হরকত-এ-ইনকিলাবি ইসলাম এই সময় নিজেদের গুটিয়ে নেয় মুসলমানের রক্তে হাত রঞ্জিত হবার ভয়ে।

আফগানিস্তানের রাজনীতিতে একজন হুসেইন মোহাম্মাদ এরশাদ আছে। সে হল আব্দুর রশীদ দস্তুম। এই লোক কমিউনিস্ট, কিন্তু তার আদর্শ হলো অধিকাংশ সময় পরাজিত দলের পক্ষ ত্যাগ করে জয়ীর সাথী হওয়ার। দস্তুম আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আশ্রাফ গনির প্রতিদ্বন্দ্বী। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এই দস্তুমকে সাথে নিয়েও মাসুদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছে।

মাসুদ চেয়েছিল একটা সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে তার দল জমিয়তের মাধ্যমে আফগানিস্তানে সুফিপন্থি এক ধরণের জগাখিঁচুড়ি ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু মাসুদের সরকার বস্তুত দেশ গঠনের তেমন কোন সুযোগ পায়নি।

মুজাহিদিনদের বড় বড় ওয়ারলর্ডেরা যখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান এক চরম মুহূর্ত অতিক্রম করছে। এই ব্যাপক হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিসের সুযোগে বহু লোকাল অস্ত্রাধারী অপরাধী অরাজকতা চালাতো, যাদের দমনে কাবুলের সরকারের কোন উদ্যোগই ছিলনা। রাহাজানি, হত্যা আর মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্মের অন্ধকার ছিল একটা বটম টু টপ এপ্রোচ রিভল্টের জন্য আদর্শ সময়। সেই অভূতপূর্ব সময়ে আহমেদ শাহ মাসুদ তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পায়। মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার কখনই তার চিহ্নিত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আহমেদ শাহ মাসুদকে পরাজিত করতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে তালেবান কর্তৃক কাবুল বিজিত হলে আফগানিস্তানে এক নতুন ও আপোসহীন আদর্শের সূচনা করে মোল্লা ওমর। তার এই আদর্শ সম্ভবত সেই আদর্শ যা ওসামা বিন লাদেন তালাশ করেছিল গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের মধ্যে এবং তার দীক্ষাগুরু (আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম) ফিলিস্তিনে।

তালেবান বছর তিনেকের প্রচেষ্টায় প্রায় ৮০% আফগানিস্তানে তাদের ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্ঠা করে। মাসুদের সঙ্গে মোল্লা ওমরের পার্থক্য ছিল দেশ গঠনের আদর্শে। মাসুদ দাবি করেছিল যে তালেবান তাকে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য একাধিকবার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মাসুদ মোল্লা ওমরের ইমারতের আদর্শে

বিশ্বাস করতনা। সে গণতন্ত্রকে একমাত্র দীর্ঘমেয়াদি আধুনিক সমাধান বলে মনে করত। (সম্ভবত আবুল আলা মওদুদির একটা ভার্শন)

সে কখনই তালেবানের আদর্শের কাছে হার মানতে চায়নি। বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মোল্লা ওমরকে সাথে নিয়ে দেশ গঠনে আগ্রহী ছিল।

২০০১ সালে নাইন ইলেভেনের দুই দিন আগে (সম্ভবত ওসামা বিন লাদেনের অনুসারীরা) আহমেদ শাহ মাসুদকে হত্যা করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই হত্যার সঙ্গে নাইন ইলেভেনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আর সুযোগ পেলনা মাসুদকে পরাজিত করবার, আদর্শ কিংবা রণকৌশলে। বোরহানউদ্দিন রব্বানি অনেক আগেই মাসুদের ছায়ায় পরিণত হয়েছিলেন এবং আমেরিকান আগ্রাসনের পর আমেরিকার অনুগত সরকারের প্রধান হয়ে জাত মান সবই খুঁইয়েছেন। ওসামা বিন লাদেন যদি মাসুদকে হত্যাও করে থাকে, তার আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। আমৃত্যু শের এ পাঞ্জেশির আহমেদ শাহ মাসুদ ছিল তার প্রিয় উপত্যকা, পাঞ্জেশিরের মতই অপরাজেয়।

তবুও মাসুদের মত ব্যক্তিত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল মোল্লা ওমর। সোভিয়েত যুদ্ধের লো প্রোফাইল আর্টিলারি চালানো সৈনিক থেকে আফগানিস্তানের ডি ফ্যাক্টো লিডার। মোল্লা ওমর মাসুদকে হারিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ দিয়ে। কিন্তু মাসুদ তো সেই পথ সন্তপর্ণে এড়িয়ে গিয়েছিল। তাহলে কে বিজয়ী হয়েছিল এই ডুয়ালে?

মাসুদের মৃত্যুর পর তার দল জমিয়তে আরেকজন আপোসহীন মাসুদ আপনি পাবেন না। অপরদিকে মোল্লা ওমর তার পরে অসংখ্য মোল্লা ইয়াকুব রেখে গেছে। এবং তালেবান বিশ্বাস করে, মোল্লা ইয়াকুব কিংবা সিরাজের মত লেগাসিই একদিন মোল্লা ওমরের আদর্শে মাসুদের স্বপ্ন পূরণ করবে।

কথা হচ্ছিল হেকমতিয়ার প্রসঙ্গে। আমেরিকান আগ্রাসনের প্রারম্ভে হেকমতিয়ার তালেবান এবং ওসামাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। কিন্তু এরপর আফগান রাজনীতি থেকে উধাও হয়ে যায়। সর্বশেষ প্রায় একযুগ পরে যখন সে আবির্ভূত হয় সেটাও আরেক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভাবনের মাধ্যমে; গনির সঙ্গে সন্ধি করে, তালেবানকে নেগোসিয়েশনের আহবান করে এবং কাবুলের পুতুল সরকারের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এবং ক্ষমা পেয়ে।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে হয়তো বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তার উপর নির্ভর করা যায়না। সোভিয়েত যুদ্ধ কিংবা আমেরিকান আগ্রাসনের আগ পর্যন্ত গুলবুদ্দিনের সঙ্গে এক সিরিয়ান বিদ্রোহির বেশ কিছুটা মিল মনে হয়।

আবু বকর আল বাগদাদি।

ক্রমঃ ১৮

বিশ্বব্যাপী আলোচিত সংবাদমাধ্যম রয়টার্স ১১ই সেপ্টেম্বার ২০১২ তে একটা আর্টিকেল প্রকাশ করে।

শিরোনামঃ Taliban raked in $400 million from diverse sources - UN

এই লেখার প্রথম দুই লাইনে রয়টার্স লিখেছেঃ

> *Most locally sourced taxes kept to support local operations
> *Afghan opium poppy trade not main source of Taliban funding

আজকের লেখাটাকে আমরা মূলত তিনটে অংশে বিভক্ত করেছি।

প্রথমাংশে আমরা উত্তর দেবার চেষ্টা করবো যে সত্যিই আফিম তালেবানের অর্থের মূল উৎস কিনা। এই অংশটিকে আমরা যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত দেবো রেফারেন্স সহ। এবং পশ্চিমা মিডিয়াতে উঠে আসা রেফারেন্স গুলোর মাধ্যমেই তাদের বর্তমান রিপোর্টগুলোকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করবো। ২য় অংশে তালেবানের আয়ের উৎস সম্পর্কে কিছুটা বলবার চেষ্টা করা হবে। ৩য় ও শেষ অংশে আমরা আলোচনা করবো কেন পশ্চিমা মিডিয়ায় এই বিষয়গুলো এখন আবার প্রায়োরিটি পাচ্ছে।

১ম অংশঃ আফিম কি আসলেই তালেবানের আয়ের উৎস?

মূলত তিনটি ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা আফিম চাষ তালেবানের আয়ের উৎস কিনা বুঝবার চেষ্টা করবোঃ

২০১২ ও ১৮ সালে -

১। তালেবানের অধিকৃত আফগান ভূমির শতকরা পরিমাণ
২। তালেবানের আয়ের পরিমাণ
৩। আফিম ইন্ডাস্ট্রির ভলিউম

২০১২ সালের ১৭ই এপ্রিল আলজাজিরা তাদের Inside Story সিরিজের একটা ভিডিও পাবলিশ করে; "Who really controls Afghanistan? " এখানে প্রদর্শিত ম্যাপ অনুযায়ী আফগানিস্তানের ২০-২৫% এলাকায় তালেবান প্রভাব ছিল। আমরা ধরে নিচ্ছি তালেবানের প্রভাব ২০-২৫% হলে কন্ট্রোলে ছিল

১০%। ২০১৮ এর শেষ নাগাদ আফগানিস্তানে তালেবানের কন্ট্রোল হল ৬৫% অর্থাৎ ২০১২ এর তুলনায় ৬ গুণ।

লেখার শুরুতে রয়টার্সের যে আর্টিকেলের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী আফগানিস্তানের আফিম ইন্ডাস্ট্রির ভলিউম ছিল ২০১২ সালে ৪ বিলিয়ন বা ৪০০০ মিলিয়ন ডলারের। বর্তমানে এই ইন্ডাস্ট্রি ১৫০০ থেকে ৩০০০ মিলয়নে নেমে এসেছে। (BBC, Dec 22,2018 How does the Taliban make money? অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি প্রায় অর্ধেক হয়েছে।

জাতিসংঘ এবং সমস্ত সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে তালেবানের বাৎসরিক রেভিনিউ ছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলারের। (যদি ধরে নেই তালেবানের আয়ের উৎসের পুরোটাই আফিম থেকে আসে, তাহলে ২০১২ সালে বাকি ৩৬০০ মিলিয়ন ডলার ভলিউমের আফিম কারা চাষ করতো? আমেরিকা ও তাদের কাবুলের পুতুলেরা?)

আর বর্তমানে তালেবানের আয় ১৫০০ মিলিয়ন ডলার। (bbc এর আগের রেফারেন্স) অর্থাৎ প্রায় চারগুণ হয়েছে।

তাহলে সামারি হল এই যে ২০১২ থেকে ১৮ এই ৬ বছরে পপি ইন্ডাস্ট্রি অর্ধেক হয়েছে, তালেবানের আয় বেড়েছে ৪ গুণ আর অধিকৃত আফগান ভূমির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৬ গুণ। তাহলে আফিম ইন্ডাস্ট্রি ভলিউমের সঙ্গে তালেবানের আয়ের সম্পর্ক ব্যাস্তানুপাতিক; অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি ছোট হলে আয় বাড়ে। আফিম যদি আসলেই তালেবানের আয়ের প্রধান উৎস হত তাহলে কি এমন হবার কথা ছিল?

অন্যদিকে তালেবানের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ বাড়ার ফলে আফিম ইন্ডাস্ট্রির ভলিউম কমে গেছে। এর সঙ্গে ২০০১ সালের তথ্য যোগ করুন। ২০০১ সালে ৯০% জমি ছিল তালেবানের দখলে এবং আফিম ইন্ডাস্ট্রির ভলিউম ছিল শূন্যের কাছাকাছি।

(আলজাজিরার inside story এর দেওয়া লিংক এবং Where have all the flowers gone?: Evaluation of the Taliban Crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan, International Journal of Drug Policy 16(2005) by Graham Farrell, Dept. of Social Science, University of Loughborough & John Thorne, Dept. of criminal justice, University of Cincinnati)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আফিম চাষের সঙ্গে তালেবানের আয়ের উৎসকে লিংক করা বেশ কষ্টসাধ্য হলেও এটা জোর করে প্রমাণের চেষ্টা চলছে মিডিয়ায়। কেন চলছে সেটা পরে আসছি। আমরা এখন আলোচনা করবো তালেবানের আয়ের উৎস কী হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

২য় অংশঃ তালেবানের সম্ভাব্য আয়ের উৎস

এই উৎসগুলোর কোনটা থেকে বেশি টাকা আসে সেই অর্ডারে সাজানো নয়। আমরা দুটো জিনিস মাথায় রেখে উৎসগুলো বিবেচনা করবো। সে দুটো হলো, গত ৬ বছরে তালেবান অধিকৃত এলাকা ৬ গুণ হয়েছে এবং তাদের আয় বেড়েছে ৪ গুণ।

১। ইনকাম ট্যাক্স ও ফসলের উপর ট্যাক্স

ইসলামী শরীয়াহতে যাকাত নামে একটা অর্থব্যবস্থা রয়েছে যা ধনীব্যক্তিদের আয়ের ২.৫% সরকারকে সংগ্রহ করবার অনুমতি দেয়। ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তানের (তালেবানের দাবিকৃত সরকার) আয়ের একটা উৎস এই যাকাত এবং ফসলের উপর শরীয়াহসম্মত হারে ট্যাক্স।

অধিকৃত এলাকার পরিমাণ বাড়লে এ থেকে ইনকাম বাড়ার কথা। কারণ তখন অধিক মানুষ থেকে যাকাত আদায়ের সুযোগ তৈরি হয় আর বেশি জমির ফসল এর আওতায় আসে।

২। সরকারি সেবার বিনিময়ে অর্থ

পৃথিবীর সমস্ত সরকারই বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সেবার মাধ্যমে আয় করে জনগণের কাছ থেকে। আর এই আয়ও অধিকৃত আফগান ভূমির সাথে সমানুপাতিক।

৩। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য

গত ছয় বছরে তালেবান আফগান সীমান্ত এলাকায় আরও বেশি পরিমাণ আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। এতে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের আয় বেড়েছে।

৪। গণিমত

যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকা ও ন্যাটোর পালিয়ে যাবার সময়কার সম্পদ যা তারা পেছনে রেখে যায়। গত কয়েক বছরে এই পরিমাণ বাড়বার কথা। যেহেতু ন্যাটোর কাছ থেকে বহু এলাকার দখল ইমারতের দখলে গেছে।

৫। ব্যক্তিগত দান

এলাকাভিত্তিক আধিপত্য বাড়বার কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা ব্যক্তিগত দান বাড়বার কথা। তবে আমরা মনে করি ১৭ বছরে আমেরিকা এই সাপ্লাই লাইন বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর।

এছাড়াও বিদেশি টেলিকম কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে আফগানিস্তানে ব্যবসা করবার বিনিময়ে তালেবান ট্যাক্স নেয় বলে আমরা ধারণা করি। এই ট্যাক্সভিত্তিক ইনকামও আধিপত্য বিস্তারের সাথে সমানুপাতিক। তালেবানের আয়ের উৎস নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ এখানেই। আমরা এখন আলোচনা করবো কেন হঠাৎ এই আলোচনাকে আবার জোর করে মিডিয়ায় আনা হচ্ছে।

৩য় ও শেষ অংশঃ কেন পশ্চিমা মিডিয়ায় এই বিষয়গুলো এখন আবার প্রায়োরিটি পাচ্ছে?

সম্ভবত প্রশ্নের উত্তর আপনারা জানেন।

২০০১ সালে আমেরিকা তালেবানকে হামলা করে মূলত আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার কারণে। তারা বলে যে ওসামা বিন লাদেন টুইন টাওয়ারে হামলা করেছে আর মোল্লা ওমর ওসামাকে আশ্রয় দিচ্ছে।

নেগোসিয়েশনের প্রথম ধাপে এনভয় জালমে খলিলজাদ তালেবানকে প্রস্তাব দেয় আল কায়েদা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার। যদি তালেবান তা করে তাহলে আমেরিকা মিডিয়ায় বলতে পারবে যে, আমরা আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার কারণে আফগান আক্রমণ করেছিলাম আর ফিরে যাচ্ছি কারণ কায়েদার সঙ্গে এখন তালেবান কিংবা গনি নেই। টেররিস্ট হার্বর থেকে আমরা আফগানিস্তানকে শান্তির রাজ্যে পরিণত করেছি।

তালেবান তাতে সম্মত হয়নি বলেই মনে হয়। কারণ কায়েদার সঙ্গ ত্যাগ করা তালেবানের জন্য এখনই কঠিন। কায়েদা ও তালেবান সম্পর্ক নিয়ে আমরা এর আগে মোল্লা ওমরের নীতি আলোচনা করেছি যা ছিল বন্ধুত্বের কিন্তু পারস্পারিক ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা।

এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকা এখন তাদের সাফল্য দেখাতে যাচ্ছে পপি চাষে।। তারা দেখাচ্ছে যে তালেবান আফিম চাষ করে আফগানিস্তানকে মাদক রাজ্যে পরিণত করেছিল। আমরা এই ১৮ বছরের যুদ্ধ করে তা রদ করেছি। এজন্যই তাদের মিডিয়াগুলোকে তারা এই কাজে ব্যবহার করছে। আমেরিকা আফগান যুদ্ধে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে সম্মানজনক এক্সিট খুঁজছে।

বাংলাদেশের সেক্যুলার মিডিয়াও বুঝে না বুঝে জনগনকে এগুলো খাওয়াচ্ছে। কারণ তারা ইসলামিক যেকোন কিছুকেই প্রোপাগান্ডা দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চায়।

তালেবান শাসনামলের শেষদিকে মোল্লা ওমর আফগানিস্তানে আফিম চাষকে প্রায় ১% এ নামিয়ে ফেলেছিল। সেই সময় আহমাদ শাহ মাসুদ অধিকৃত (সমগ্র আফগানের ১০% এর কম) পাঞ্জেশিরেও আফিম চাষ হত না।

সর্বোপরি পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে আমেরিকা বেশ বাজে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে তাদের পাগল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার প্রলাপ। জালমে খলিলজাদের হাতে খুব বেশি অস্ত্র আর নেই। তবে যাবার আগে সব বাহিনীই একটা মরণ কামড় দিয়ে যেতে চায়। সোভিয়েতও তাই করেছিল ৩০ বছর আগে।

বিপদে আছেন প্রেসিডেন্ট গনিও। তিনবার পিছিয়ে অবশেষে জুলাই ২০ এ কি আদৌ হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন? নাকি তার আগেই Spring Offensive 2019 এ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে গনির সাজানো বাগান? দেখা যাক।

ক্রমঃ ১৯ - মোল্লা ওমর

মোল্লা ওমরের পুরো নাম মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর; জন্ম কান্দাহারে। ১৯৬০ সালে khakrez ডিসট্রিক্টের chah-i-himmat গ্রামে। বাবার নাম মৌলভী গোলাম নবী, দাদা মোহাম্মাদ রসূল।

মোল্লা ওমরের বাবা এবং চাচারাও মূলত মাদ্রাসা শিক্ষক ছিলেন। প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা হিসেবে তার বাবার কিছুটা পরিচিতি ছিল। পাঁচ বছর বয়সে ওমরের বাবা মারা যান এবং ওমরের পুরো পরিবার Uruzgan প্রদেশে চলে যায়। ওমর বড় হতে থাকে তার চাচা আনোয়ার এবং জুম্মার তত্ত্বাবধানে। পারিবারিকভাবেই মোল্লা ওমর তার প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে এবং আট বছর বয়সে তার চাচা মৌলভী জুম্মার মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। এই মাদ্রাসা থেকেই শেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা।

কাবুলে কমিউনিস্টরা যখন দাউদ খানকে হত্যা করে, তখন মোল্লা ওমরের মত অনেক ছাত্রই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কারণ কমিউনিস্টরা তখন আফগান মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অল আউট আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ইসলামী শিক্ষক, উলামা ও ছাত্র তথা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এর বিপরীতে আফগানিস্তানের একেবারে রুট লেভেলের মাদ্রাসা ছাত্র মোল্লা ওমর থেকে এলিট শ্রেণীর বোরহানউদ্দিন রব্বানিরা এগিয়ে আসে ইসলামের সুরক্ষায়। তারা বিভিন্ন ফ্র্যাকশানে প্রো-রাশিয়ান কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।

মোল্লা ওমর লড়াই করেছিল মোহাম্মাদ নবী মোহাম্মাদির হরকত-ই-ইনকিলাবি ইসলামের ব্যানারে। খুব অল্প কিছুদিনেই মোল্লা ওমর তার রণকৌশল ও সাহস দিয়ে স্থানীয়দের মন জয় করে ফেলে। কমিউনিস্ট বিরোধী অপারেশনে একের পর এক সাফল্য তাকে Deh-Rawud ডিস্ট্রিক্টের মুজাহিদিন কমাণ্ডার বানিয়ে দেয়। ১৯৮৩ সালে ওমর maiwand ডিস্ট্রিক্টে ফাইজুল্লাহ আকুন্দজাদার অধীনে যুদ্ধ করতে থেকে (হরকত ই ইনকিলাবি ইসলাম)। এই সময় রাশিয়ার সৈন্যরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সৌদি এবং উপমহাদেশের উলামা এই লড়াইকে ইসলামী ধর্মযুদ্ধ জিহাদ আখ্যা দেয়।

ওমর হেরাত-কান্দাহার হাইওয়েতে বহু রাশান ট্যাংক ও বহরকে ধ্বংস করে। রাশানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওমর মোট চারবার গুরুতর আহত হয় এবং এর মধ্যে একবার তার ডান চোখের দৃষ্টি চিরতরে হারিয়ে ফেলে। রাশানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোল্লা ওমরের দুইটি কিংবদন্তি অভিযানের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করবোঃ

১. Budwan নামে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে একটা রাশান ট্যাংক ছিল। এই ট্যাংকের কারণে বহু চেষ্টার পরেও মুজাহিদিন ঐ স্ট্রাটেজিক পয়েন্টটা দখলে নিতে পারেনি। একাধিক ব্যর্থ চেষ্টার পর ট্যাংকটা ধ্বংসের জন্য মোল্লার ওমরকে ডেকে পাঠানো হয়। ওমর তার RPG দিয়ে ট্যাংকটা ধ্বংস করে।

2. Sang-i-Hisaar (Zhari District) এলাকা দিয়ে একটা রাশান বহর যাচ্ছিল। সেই সময় মোল্লা ওমরের সাথে ছিল মাত্র চার রাউন্ড RPG. কিন্তু পিছু দমবার পাত্র ছিলনা ওমর। মাত্র চার রাউন্ড দিয়েই চারটে ট্যাংক ধ্বংস করেছিল। এই অপারেশনে ওমরের সঙ্গী ছিল তার প্রিয় মোল্লা আব্দুল গনি বিরাদার আকুন্দ ওরফে মোল্লা ব্রাদার।

রাশান যুদ্ধের শেষে ওমর তার অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ হয়েছে বলে ভেবেছিল। কান্দাহারে সে তার লেখাপড়া শেষ করবার দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু যুদ্ধ তার পিছু ছাড়েনা। ওমর ততদিনে অবশ্য বয়সে ৩০ পেরিয়ে গেছে।

কমিউনিস্ট নাজিবুল্লাহর পতনের পর কাবুলে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। পরবর্তীতে মাসুদ -হেকমতিয়ার ও অন্যান্য ফ্র্যাকশন পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে হরকত-ই-ইনকিলাবি ইসলামের লীডার মোহাম্মাদ নবি মোহাম্মাদি আফগানিস্তানের রাজনীতি থেকে সরে যান। সেই সময় মোল্লা ওমর তার অসম্পূর্ণ শিক্ষার পাঠ শেষ করছিল কান্দাহারের maiwand ডিস্ট্রিক্টে।

এই সময় আফগানিস্তানে নৈরাজ্যের ইতিহাস আমরা এর আগের পর্বগুলোতে উল্লেখ করেছি। রাশান জিহাদে আফগান উলামার স্বপ্নের ইসলামিক আফগানিস্তানের বদলে ফসল হয়েছিল এমন একটি আফগানিস্তান যা দুর্নীতিগ্রস্থ Warlord দের অন্তর্বর্তী যুদ্ধ, লুটতরাজ, ধর্ষণ, বাচ্চাবাজি ও হাইওয়েতে পয়েন্টে পয়েন্টে আনলিমিটেড চাঁদাবাজিতে ভরপুর।

এই অবস্থায় রাশান জিহাদে অংশ নেওয়া আলোকিত মুজাহিদিন অংশ, কান্দাহারের Panjwan District এ একটা মিটিং আয়োজন করে। এটা ছিল মূলত পচে যাওয়া সামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ধর্মীয় নেতাদের একটা কনফারেন্স। এর নেতৃত্ব দেন মৌলভী সাইদ মোহাম্মাদ যিনি ছিলেন সোভিয়েত যুদ্ধে কান্দাহারের মুজাহিদিন জেনারেল। মৌলভী সাইদের নেতৃত্বের এই উলামা সম্মেলন মোল্লা ওমরকে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়।

১৯৯৪ সালের ২৪ জুন কান্দাহারে মোল্লা ওমর ও তার সোভিয়েত জিহাদে অংশ নেওয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়ে তালেবান।

প্রথমে তালেবান কান্দাহারে একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। লোকাল দুর্নীতিবাজ ওয়ার লর্ডদের থেকে মুক্ত করে। মূলত সেই সময় কান্দাহারে কেন্দ্রীয় মাসুদ সরকারের কোন কর্তৃত্বই ছিলনা। বরং কেন্দ্রীয় সরকার ব্যস্ত ছিল রাজধানী সিকিউর করা ও হেকমতিয়ার-রশীদ-দস্তুম ইত্যাদি গ্রুপের দমনে। এখানে প্রশ্ন এসে পড়ে যে কেন আফগান উলামার একটা বড় অংশ রব্বানি-মাসুদের সরকারকে সাহায্য না করে আলাদা করে মোল্লা ওমরের পেছনে সমবেত হয়েছিল? এর কারণ ছিল বোরহানউদ্দিন রব্বানির পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রপ্রেমী আদর্শ।

কাবুলের অভিমুখে মার্চ করবার আগে তালেবান এক অভূতপূর্ব অবস্থার সম্মুখীন হয়। কাবুল তখন মাসুদের অধীনস্থ। কান্দাহার বা অন্যান্য জায়গায় দুর্নীতিগ্রস্থ মাস্তান ওয়ার্লর্ডদের বিরুদ্ধে লড়তে মোল্লা ওমরের কোন দ্বিধা ছিলনা। কিন্তু সমগ্র আফগানিস্তানের দখল নিতে হলে তালেবানের মাসুদ এবং হেকমতিয়ারের মত কিংবদন্তি জেনারেলদের বিরুদ্ধে লড়তে হত, যারা সোভিয়েত যুদ্ধে ধর্মপরায়ণ দুর্দান্ত সাহসী মুজাহিদ।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৬ সালে কান্দাহারে এই ডেডলক থেকে মুক্তির জন্য এক বিশাল উলামা সমাবেশ করা হয়। প্রায় ১৫০০ স্কলারের সমন্বিত পরিষদ ওমরকে আমীরুল মুমিনীন টাইটেল প্রদান করেছিল। এটা ছিল কমপক্ষে সমগ্র আফগানিস্তানকে তালেবান নেতৃত্বাধীন ইসলামিক ইমারতের অধীনে আনবার জন্য মোল্লা ওমরের Religious License. মাসুদের ভাষ্যমতে, তালেবান মাসুদকে একাধিকবার ইমারতের প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব করেছিল যা কিনা প্রমাণ করে যে ব্যক্তি মাসুদের সঙ্গে ওমরের কোন বিরোধ ছিলনা; বিরোধ ছিল আদর্শে।

কাবুল দখলের পর প্রায় ৯০% এর অধিক আফগানিস্তানের কন্ট্রোল মোল্লা ওমরের হাতে চলে আসে। তা সত্ত্বেও মোল্লা ওমরের ব্যক্তিগত জীবনে এর তেমন কোন প্রভাব চোখে পড়েনি। ওমর বরাবরই স্বল্পভাষী, লাজুক স্বভাবের। কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী। তার এই স্বভাবের পরিচয় আরও বেশি ফুটে ওঠে যখন আমরা দেখি, দীর্ঘ ৫ বছর আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকবার পরও তার কোন ছবি পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে নেই। কেবল একটা ছাড়া। বাকিটা হল তার তালেবান প্রকাশিত ফাইল ছবি; তরুণ বয়সের।

২০০১ সালে আমেরিকার আক্রমণের পর মোল্লা ওমর বিভিন্ন পাহাড়ি দুর্গম এলাকা থেকে আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ইসলামিক ইমারতের ব্যানারে মুজাহিদিনদের সংগঠিত করতে থাকে। এবং তার জীবদ্দশায় তালেবানকে আফগানিস্তানের সবচাইতে শক্তিশালি সর্বভৌম শক্তি হিসেবেই রেখে যায়, যারা বিদেশী সহায়তা ছাড়াই দেশ চালাতে সক্ষম। ২০১৩ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে (সম্ভবত যক্ষায়) তার মৃত্যু হয়।

দীর্ঘ যোদ্ধা জীবনে, মোল্লা ওমরের সবচাইতে বড় লেগ্যাসি হল তার প্রতিষ্ঠিত তালেবান। ১৯৯৬ থেকে আজ পর্যন্ত নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে আজ দ্বিতীয়বারের মত কাবুল দখলের দ্বারপ্রান্তে তালেবান। দীর্ঘ এই যাত্রায় তালেবান ইসলামিক শরীয়াহর আলোকে আফগানিস্তান পরিচালনার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যহত রেখেছে। কোথাও তাদের পলিসি আলোর মুখ দেখেছে, কোথাও মুখ থুবড়ে পড়েছে, কোথাও তাদের সাফল্যকে পশ্চিমা মিডিয়া ব্যর্থতা হিসেবে প্রচার করেছে (যেমন মাদক উৎপাদন বন্ধ, বাচ্চাবাজির জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ইত্যাদি)।

মোল্লা ওমরের জীবন এক কষ্ট সহিষ্ণু যোদ্ধার জীবন। ১২ বছর যুদ্ধ করে দেশকে কমিউনিস্ট বলয় থেকে মুক্ত করবার পর দেশ শাসনের ভার বহনের জীবন। যার মাঝপথে রয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উচ্ছিষ্ট হবার বেদনা আর শেষে রয়েছে তা ফিরে পাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা, আর এই চেষ্টাই তার মুজাহিদ প্রাণকে হরণ করেছিল। মোল্লা ওমরের ব্যক্তিত্বকে বুঝবার জন্য আমরা নিচে তার জীবনের দুইটি সন্ধিক্ষণের বক্তব্য তুলে ধরছিঃ

১. টুইন টাওয়ার ঘটনার পর, আমেরিকা কর্তৃক যখন বলা হচ্ছিল যে ওসামাকে দাও নইলে আমেরিকার আক্রমণের শিকার হও, মোল্লা ওমর বলেছিল,

> "আল্লহ সর্বশক্তিমান, আমেরিকা হোক আর ছোট্ট পিঁপড়ে, আল্লহর কাছে এদের কোনই পার্থক্য নেই। আমেরিকা আর বন্ধুরা শুনে রাখুক, ইসলামি ইমারত অন্য রেজিমগুলোর মত নয় যার আমীর জহির শাহের মত আফগানিস্তান ফেলে রোমে পালিয়ে যাবে। আর আমার সৈন্যরা কোনদিন তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণও করবেনা। মনে রেখ, আমাদের ফ্রন্ট এক সুসংগঠিত জিহাদি ফ্রন্ট। যদি কাবুল এবং অন্যান্য শহরগুলোর পতন হয়, আর ইসলামিক সরকারকে উৎখাত করা হয়, আত্মসমর্পণের বদলে আমাদের মুজাহিদিন সমস্ত দেশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে যাবে আর পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। কী করবে তোমরা তখন? একদিন তোমাদেরকেই বরং ধরে ধরে হত্যা করা হবে রাশানদের মত।
>
> তোমাদের বোঝা উচিত যে নৈরাজ্য তৈরি করা সহজ কিন্তু তা মিটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। মৃত্যু তো সবারই আসবে। নিজের ইজ্জত আর ধর্মকে বিক্রি করে আমেরিকাকে সমর্থন করবার চাইতে, ইসলামের জন্য ইজ্জত নিয়ে মরে যাওয়াই কি ভালো নয়?"

মোল্লা ওমরের কথা আজ এই ১৮ বছর পরে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। তার পরিকল্পনা অনুযায়ীই তালেবান ফিরে এসেছে আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে আর বেদম মার খেয়ে দিশেহারা হয়েছে আমেরিকা। আর ইজ্জতের সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে মোল্লা ওমরের।

২. ২য় ঘটনাটা হল ১৯৯৬ সালের। সম্ভবত এটা মোল্লা ওমরের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঘটনাটা সেই উলামা সম্মেলনের, যেখানে ১৫০০ উলামা মোল্লা ওমরকে আমীরুল মুমিনীন টাইটেল প্রদান করেছিল। মোল্লা ওমর সেদিন গর্বে উদ্দীপিত হয়ে কোন স্মরণীয় নেতার ভাষণ দেয়নি, অথবা নিজের প্রাপ্য সম্মান মনে করে উলামাকে ধন্যবাদ দেয়নি। ওমর সেদিন কেঁদেছিল, তার চোখের পানিতে কাঁধ পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। আর কাঁদবে নাই বা কেন। এই টাইটেল যে ভারি, তা বহন করবার মত যোগ্যতা খুব কম মানুষেরই আছে।

> "হে আলেমগণ, আপনারা নবী মোহাম্মাদের (স) ওয়ারিশ। আর আপনারা এক বিশাল দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়েছেন। তবে বাস্তবে, আপনারাই আমার সফলতা ও বিচ্যুতির দায়ভার বহন করবেন।
>
> ও আমাদের শিক্ষক আর সম্মানিত স্কলার মহোদয়, যদি আমি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা থেকে বিচ্যুত হই, তবে আপনাদেরকেই আপনাদের জ্ঞান দিয়ে আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে হবে। যদি তালেবান শরীয়াহ ইমপ্লিমেন্টেশনে ভুল করে, আর আপনার জেনে বুঝেও তাদেরকে শুধরে না দেন, তাহলে কাল কেয়ামতে আপনারকেও জবাবদিহি করতে হবে। "

মোল্লা ওমরের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। দরিদ্র অবস্থায়ই ওমর তার পিতার ঘরে জন্মেছিল, চাচার কাছে মানুষ হয়েছিল, কাবুলের মসনদের অধিকারী হয়েছিল আর অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছিল। আমেরিকা ২০০১ সালে তালেবান লীডারদের বিদেশি ব্যাংক একাউন্ট সীজ করবার চেষ্টা করে। তখন দেখা যায় তালেবানের সুপ্রিম মোল্লা ওমরের কোন একাউন্টই নেই। আমেরিকা যখন মোল্লা ওমরের পরিবারের সদস্যসহ তার বাড়ি বিমান হামলায় গুড়িয়ে দিয়েছিল, তখন ওমরের কাছে আরেকটি বাড়ি বানাবার মত পয়সা ছিলনা।

This is how you sow seeds with utmost patience. Muhammad (SAW), The Prince of Abdullaah brought The New Sabian Faith to the Arabian Peninsula. He, in his lifetime, couldn't see the resultant civilization at its peak. And so didn't Umar and Monsur. But the day is not far away when we can quiz our children -

> : Name the 2 Superpowers since the 2nd World War.
> -Off course Russia and US
> :And name the Superpower to whom they both were defeated; in the land where a hero was born?
> Umar, The Molla One.

যার মৃত্যুর খবরে কেঁদেছিল লক্ষ মুসলমান; মিসিসিপি থেকে শ্রীনগর।

ক্রমঃ ২০ - Who Controls What

তালেবান সম্প্রতি দাবি করেছে যে আফগানিস্তানের সম্পূর্ণ মানচিত্রের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এলাকা তাদের পুরোপুরি বা প্রায় সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে। এর বিপরীতে আমেরিকা সমর্থিত রেজিমের দখলে আছে ১৫% এর মতো আর ১% বা তারও কম দায়েশের দখলে। বাকি Contested area ৪৪% এর মধ্যে ২৫% এ তাদের প্রভাব বেশি এবং ১৯% এ অন্যদের।

উপরের হিসাব মানচিত্রে রাফ নেওয়া।

গাণিতিক যোগ বিয়োগ করে তাদের স্পেসিফিক দাবি হল, সাড়ে ছয় লক্ষ বর্গকিলোমিটারের আফগানিস্তানের প্রায় ৬৫.০২% এর কিছু বেশি অংশে প্রাধান্য রয়েছে তালেবানের এবং বাকি ৩৫% এ আমেরিকা সমর্থিত সরকারের (নানগড়হরের নগণ্য অংশে আইসিস সহ)। কিন্তু এই পরিসংখ্যানের বাইরে একটা কথা থেকে যায় তা হলো, আমাদের জানামতে এখনও ৩৪ প্রদেশের একটা রাজধানীও তালেবানের দখলে নেই।

এপ্রিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আরেক দফা পিছিয়ে জুলাইতে নেওয়া হয়েছে। জুলাই নাগাদ ৬৫% এর এই কন্ট্রোল প্রায় ৭৫ ছাড়িয়ে যাবার কথা এবং অন্তত দুটো প্রাদেশিক রাজধানী দখলে চলে যাবার কথা। অথবা পার্লামেন্ট ইলেকশনের মতই Storm Raid দেবে হয়তো।

ক্রমঃ ২১ - পুতুল সরকার

কোন সরকার এমন হয়, যে তাকে ক্ষমতায় আনতে বা টিকিয়ে রাখতে, প্রকাশ্যে বিদেশি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা পুতুল সরকার।

উদাহরণঃ সবচাইতে সুন্দর বুকিশ আদর্শ উদাহরণ হল বাবরাক কার্মালের আফগানি সরকার বা নূর মালেকির ইরাক সরকার। বিদেশী সাহায্য কোন সরকারকে পুতুল সরকার বানায় না। কেননা তাহলে ১৯৭১ থেকে শেখ মুজিব, জিয়া সবার সরকারকেই পুতুল বলতে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা ছিলনা।

বিদেশী লোকবলের কন্ডিশনে বর্তমান গনির সরকার পুতুল সরকার হয়ে যায়। তবে এই সংজ্ঞায় ব্যতিক্রম থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। যেমন বংগবন্ধুর আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর পিছনে ভারতে বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আওয়ামীলীগ এর নিজেকে ডিফেন্ড করবার সার্বভৌমত্ব থাকায়, তাকে আমরা পুতুল মনে করবোনা।

আবার স্বীকৃত উপায়ের কথা বলেছি কারণ গোপনে অনেক সরকারকেই প্রতিবেশী দেশ লোকবল দিয়ে সাহায্য করতে পারে, অনেক দেশে করছেও। কিন্তু এর মানে এই না যে ঐ গোপন লোকবল না থাকলে ঐ সরকার সার্বভৌমত্ব হারাবে।

A government that is openly installed and/or protected by foreign armed forces, is a puppet government. Classical Example: Indian Government led by Mir Jafor under East India Company

ক্রমঃ ২২ - আল ফাত্তাহ অপারেশন লঞ্চ, শান্তি আলোচনার ইতিবৃত্ত

শীতের আফগানিস্তান যুদ্ধের জন্য একেবারেই অনুকূল নয়। তাই শীতকালে সাধারণত একটা স্টেলমেট অবস্থা থাকে। তবে এবার শীতেও তালেবান তাদের অগ্রযাত্রা অব্যহত রেখেছে। এবং সবচাইতে বড় কথা হল মেজর কোন টেরিটোরির দখল না হারিয়ে বরং আরও শক্তি প্রদর্শন করে শান্তি সম্মেলন বা মোল্লা ব্রাদার-খলিলজাদ আলোচনায় নিজেদের এডভান্টেজ নেবার মত পজিশনে রেখেছে।

শীতের শেষে, পুনরায় শক্তি প্রদর্শনের জন্য তালেবান প্রতিবারের মতই স্প্রিং অফেন্সিভ আরম্ভ করেছে। এই অফেন্সিভে তালেবান তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকে। এবারের অপারেশনের নাম আল ফাত্তাহ বা The Victory. ২০১৮ এর অপারেশনের নাম ছিল আল খন্দক। এই নামগুলো মূলত সীরাহ থেকে নেওয়া। আল ফাথ বা ফাত্তাহ বলা হয় দুটো ঘটনাকে। একটা হুদাইবিয়ার সন্ধি, আরেকটা মক্কা বিজয় (ফাথ ই মাক্কা)।

মাঠের শক্তি প্রদর্শনে কঠোর হলেও, টেবিলের আলোচনায় তালেবান ক্রমেই নমনীয় হয়ে আসছিল। অব্যহত আন্তর্জাতিক চাপ, ১৮ বছরের ক্লান্তি এবং যুদ্ধ বন্ধ করে জাতি গঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টা এর কারণ ছিল।

এর শেষ ফসল হিসেবে আমরা দেখেছি মস্কো সম্মেলনে হামিদ কারজাইয়ের মত জঘন্য লোকের সঙ্গে বসতেও তালেবান মেনে নিয়েছে, যেহেতু হামিদ এখন আর কাবুলের পুতুল সরকারের কেউ নয়।

কাতারে এরপরের সম্মেলন নিয়েই আমরা মূলত কথা বলতে চাই। কাতারের এই সম্মেলনে আফগান তালেবান তাদের মূলনীতির ক্ষেত্রেও এমনকি খানিক্টা ছাড় দিতে চেয়েছিল।

কাবুল সরকারের লোকের সাথে এক টেবিলে বসা; তালেবান এটা করতে চায়না। এটা একটা স্ট্রাটেজি। তারা বলে, "কাবুল হল আমেরিকার পুতুল। আমেরিকার উপস্থিতি থাকলে পুতুলের সরকার নেই।" তবে এই কনফারেন্সের যে শর্তটা মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় আসেনি তা হল, তালেবান বলেছে যে কাবুল সরকারের কোন ব্যক্তি যদিও আসে, তা হবে তাদের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ। তারা কাতারে কাবুল সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আসতে পারবেনা।

দীর্ঘদিন অপাংক্তেয়, অপ্রয়োজনীয় থাকবার পর কাবুলের গনি, এটাকে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে পেতে চায়। তারা এর জন্য প্রায় আড়াইশ' লোকের বিশাল লিস্ট দেয় এবং মেইন মিডিয়ায় প্রচার করতে থাকে যে

পরবর্তী কাতার সম্মেলনে কাবুল সরকার থাকছে, এমনকি তারা এই সম্মেলনের আয়োজক হিসেবেও প্রচার চালাতে থাকে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, একাধিকবার সতর্ক করবার পর তালেবান এই সম্মেলনে না আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়েছে।

সম্প্রতি আফগান ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুর রশীদ দস্তুমকে হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তালেবানের। দস্তুমকে যারা চেনে, তারা এই ঘটনায় কষ্ট পাবার কথা। সেই বাবরাক কার্মালের আমল থেকেই দস্তুম আফগান কেন্দ্রীয় রাজনীতির একটা পরগাছা।